প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া—১৩৫৭
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

প্রকাশিকা ঃ অনিন্দিতা চক্রবর্তী
২, ডাঃ দেওদার রহমন রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩৩

মুদ্রক ঃ লক্ষ্মী প্রেস,
১৮, প্যারী মোহন সুর গার্ডেন লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৮৫

প্রচ্ছদ ঃ ধীরেন শাসমল

গান ঃ জ্যোতিভূষণ চাকী

নাট্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

শকুনির পাশা

[দুর্যোধনের প্রমোদ-প্রাসাদ। সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। খর্ব্বহট্ট
এবং লম্বোদর নামে দুজন প্রহরী হাতে বল্লম নিয়ে
পাহারা দিচ্ছে।]

খর্ব্বহট্ট ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো ধরে গেল বেয়াই—একটু বসা যাক্।

লম্বোদর ॥ বোসো ক্ষতি নেই কিন্তু ঘুমিয়ে পোড়োনা যেন! তোমার তো বসলেই ঘুম আর ঘুমলেই নাক ডাকা।

খর্ব্বহট্ট ॥ কী বললে! নাক ডাকে? আমার? হা-হা-হা, সে তোমার নাক—শুনেচি বহুবার শুনেচি।

লম্বোদর ॥ শুনেচো, তবে সেটা আমার নয় তোমার নিজের। বাপরে বাপ, কী আওয়াজ!

খর্ব্বহট্ট ॥ যাক্, নাক ডাকার কথা ছাড়ান দাও বেয়াই। বুঝি কেউ এদিকে আসচে, নূপুরের শব্দ পেলুম।

[রাজবাড়ির পরিচারিকা মদনিকার প্রবেশ।
হাতে ফুলের ডালি।]

লম্বোদর ॥ বাবাঃ মদনিকাকে আজ-কাল চেনাই যায় না।

মদনিকা ॥ কী যে বলো !

লম্বোদর ॥ হ্যাগো, সত্যি বলচি। শুধোও না খর্ব্বহট্ট বেয়াইকে।

মদনিকা ॥ ওমা বেয়াই খর্ব্বহট্ট বুঝি এখানে চাকরি নিয়ে আসার আগে আমাকে দেখেচে ?

খর্ব্বহট্ট ॥ কী যে বলে মদনিকা তার ঠিক নেই। আমি যে তোমার মাসীর গেরামের লোক গো ! সেই মহাকালের মন্দির, তার ডাইনে রাখাল মালাকার, তার বাঁয়ে গদাধর মোড়ল—সেই মোড়ল হল আমার সম্পর্কে খুড়ো। তোমাকে কতো দেখেছি। তুমি যেতে আসতে, আবার যেতে, আবার আসতে, ভেঁপু বাজাতে। একবার সেই শংকরপুজোর মেলায় তালপাতার ভেঁপু বাজিয়ে আমাদের সবাইকে পাগোল করে দিয়ে চলে গেলে আর এলে না !

মদনিকা ॥ বেয়াই কী যে বলে তার ঠিক নেই ! আমি আবার ভেঁপু বাজালুম কবে ?

খর্ব্ব ॥ মনে নেই সেই যে গো, যেবার শংকরপুজোর দিন বৃষ্টি নামল, আর গদাই মোড়লের বোনপো হাতে তিরশূল নিয়ে শিব সেজে আসরে নেত্য করল—

মদনিকা ॥ গদাই মোড়লের বোনপো—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। কী যেন নাম ?

খর্ব্ব ॥ অঞ্জন!

মদনিকা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ অঞ্জন। আচ্ছা রগড় করত ছেলেটা। একবার আমাকে কাঁধে তুলে সোজা মহাকালের মন্দিরে হাজির। তারপর সে কী নাচ! তাক্‌ধিনাধিন্‌ তাক্‌ধিনাধিন্‌—হা-হা-হা!

লম্বো ॥ মদনিকে! সেই কথাটা তোমার মনে আছে তো?

মদনিকা ॥ আহা অত মিষ্টি করে বলতে হবে না। মনে আছে মনে আছে। কিন্তু এখন ওসব কথা রানীমাকে বলি কী করে। রাতদিন রাজবাড়িতে লোক গিজগিজ করছে। মহারানীকে একা পাওয়াই যায় না। চলি, আমাকে না দেখে এতক্ষণে ওদিকে হয়তো—

[ফুলের ডালি রেখে মদনিকার প্রস্থান]

লম্বো ॥ (দর্শকদের নমস্কার করে) একটা কথা আপনাদের জানানো হয়নি। আমরা হলুম মহারাজ দুর্যোধনের প্রমোদ-প্রাসাদের প্রহরী। আর ওই যে মদনিকা — ও রাজবাড়িতে কাজ করে, রানীমার পেয়ারের লোক। এক সময় ওর সঙ্গে আমার একটু ইয়ে হয়েছিল। তা বয়েস কালে ধরুন যুবক-যুবতীদের ইয়ে তো অমন কতবার হয়। যাক্‌ সে কথা, এখন ভালো করে কথাই বলেনা। হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল, আসলে ব্যাপার কী জানেন, কাল সকালে আবার পাশাখেলা হবে। ক'দিন ধরেই দেখছি কেবল দেশবিদেশের রাজারা আসছেন। কাঞ্চীর রাজা, পাঞ্চালের রাজা, পৌণ্ড্রের

রাজা! তা রাজারা আসছেন কেন? না পাশাখেলা দেখতে।

খর্ব ॥ আসল কথাটাই এখনো অবদি বলতে পারলে না বেয়াই। পাশাখেলা হবে তো রাজসভায়, তা আমরা এখানে পাহারা দিচ্ছি কেন? এটা হল মহারাজ দুর্যোধনের প্রমোদ-প্রাসাদ। মন ভালো থাকলে আমরা যেমন শুঁড়িখানায় যাই—অবিশ্যি খারাপ থাকলেও যাই। এই তো সেবার আমার সেজো মেয়েটা তিন-দিনের জ্বরে—যাক সেকথা। মহারাজ দুর্যোধনের মন ভালো থাকলে কিম্বা খারাপ হলে এখানে নাচগান ফুর্তিফার্তা চলে। আজ এখানে থাকবেন মহারাজের মাতুল! নাম করব না, আপনারা বিজ্ঞলোক অনুমানে বুঝেনিন। সেই মাতুল ভাগ্নের হয়ে পাশা খেলবেন। তাই আমাদের মহারাজ মাতুলকে আজকের রাতটা একটু আনন্দে রাখতে চান। কেবল আজকের রাত-টুকুর জন্যে তিনি প্রমোদ-প্রাসাদের অতিথি। আসল কথা হল মাতুল মহারাজের নজরবন্দী।

[অদূরে দুর্যোধনের হাসির শব্দ]

লম্বো ॥ এই চুপ। তেনারা আসচেন। এসো আমরা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ি।

[প্রহরীদ্বয় মঞ্চের বাইরে যায় এবং কিছু দূরে তারা পদচারণ করছে দেখা যায়। দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ।]

দুর্যোধন ॥ বাড়াবাড়ি কোথায় দেখলে মাতুল? এতো সামান্য

আয়োজন। কাল ভালোয় ভালোয় পাশা খেলাটা চুকে যাক তারপর দেখো তোমার হাতদুটো সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। প্রহরী—

[প্রহরীদ্বয় মঞ্চে আসে]

নর্তকী হৈমন্তিকা! না-না নটী অনুপমা! না-না শোনো, দুজনকেই ডেকে আনো।

[প্রহরীদের প্রস্থান]

শকুনি ॥ তোমার কী হল মহারাজ?

দুর্যোধন ॥ কী যে হল নিজেই জানিনা! জান মাতুল, কখনও মনে হয়—হৈমন্তিকা নাচে ভালো কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে অনুপমার জুড়ি নেই। তাই ওদের দুজনকেই—

শকুনি ॥ এতো ঘটার কী প্রয়োজন ছিল মহারাজ? তাছাড়া এই বয়সে!

দুর্যোধন ॥ দুঃশাসন মাতুলের কথা শোনো! বলে এই বয়সে!

দুঃশাসন ॥ ঠিক বলেছো মহারাজ—এই বয়সে আমাদের প্রপিতামহ শান্তনু ছিলেন তরুণ যুবক—

দুর্যোধন ॥ হ্যাঁ - সবে গঙ্গাদেবীকে বিয়ে করেছেন। তারও কতো বছর পরে সত্যবতীর সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহ। জান দুঃশাসন আমি ভেবে রেখেছি এই প্রমোদ প্রাসাদটা মাতুলকে উপহার দেব। আর তার সঙ্গে যৌতুক দেব নর্তকী হৈমন্তিকা আর অনুপমা।

দুঃশাসন ॥ তার সঙ্গে আমি দেব নর্তকী লুব্ধিকা। ওঃ লুব্ধিকার নৃত্য তোমাকে কী বলবো মাতুল! ভাবলেই আমার

বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে! ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাসাদ নির্মাণের পর অর্জুন ভায়া কী বলেছিল জান?

দুর্যো ॥ বটে, কোন বাণীটানি দিয়েছিল বুঝি?

দুঃশা ॥ আমার গুপ্তচরের মুখে শুনেছি। অর্জুন ভায়া কৃষ্ণকে বলেছিল, সবইতো হল কিন্তু দুঃশাসনের লুব্ধিকার মতো নর্তকী পাব কোথা! মাতুল সেই লুব্ধিকা হবে তোমার প্রাসাদের নটী! লুব্ধিকা নাচবে, সেই সঙ্গে নাচবে—বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ!

শকুনি ॥ তোমার লুব্ধিকার গুণকীর্তন বন্ধ করো দুঃশাসন। আমায় মাথায় কেবল এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান।

দুর্যো ॥ ঠিক বলেছো মাতুল, দুঃশাসনটা সম্প্রতি লুব্ধিকাকে নিয়ে বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। বলি তোমার লুব্ধিকা আমার হৈমন্তিকার নখের যুগ্যি নয়।

শকুনি ॥ তুমিও কম নয় মহারাজ, কাল প্রত্যূষে কতো বড়ো একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছে আর তোমরা কেবল হৈমন্তিকা আর লুব্ধিকা করছো!

দুর্যো ॥ রাগ কোরো না মাতুল, যা করেছি সব তোমার জন্যে। তোমাকে আনন্দ দেব বলেই আমার সামান্য আয়োজন। ওঃ বৃকোদরের সেদিনকার দৃষ্টির কথা ভাবলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

দুঃশা ॥ আচ্ছা সবাই যখন লজ্জায় মাথা নত করে বসে আছে, তখন ও অমন করে বার বার মাতুলের দিকে তাকাচ্ছিল কেন বলতো ?

দুর্যো ॥ রাজনীতি—রাজনীতি বড়োই জটিল দুঃশাসন। কে জানে কার মনে কী আছে ! আমার অনুমান এবার পাশাখেলার পূর্বে ওরা মাতুলকে হত্যা করবে, কিম্বা এমন কিছু করবে যাতে মাতুল প্রত্যুষে পাশা খেলতে না পারে, আর খেললেও ঠিক ঠিক দান ফেলতে না পারে, আর মাতুল ঠিক দান ফেলতে না পারলে আমি অসহায়—শিশুর মতো অসহায়।

[প্রহরীদের প্রবেশ। সঙ্গে কেবল নটী অনুপমা]

খর্ব ॥ মাপ করবেন মহারাজ আমরা অসহায়। হৈমন্তিকার হাঁটুতে খুব ব্যথা। তাই তিনি—

দুর্যো ॥ ব্যথার নিকুচি করেছে !

খর্ব ॥ বিশ্বাস করুন মহারাজ। কদিন আগেই পূর্ণিমা গেলতো ! পূর্ণিমার আবার লেজে ভারি। বাতের ব্যথাটা শেষ দিকেই বাড়ে। দেখলুম তিনি বসে বসে হাঁটুতে ইঙ্গুদি তেলের প্রলেপ দিচ্চেন। নাচের কথা বলতেই এমন মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল যে—

দুর্যো ॥ ঠিক আছে, (প্রহরীদের বাইরে যাবার ইঙ্গিত করে) বুঝলে নটী আজকের এই রাতটা মাতুলের। মাতুলের মনটা নাচে গানে ভরিয়ে দাও। যাতে মনের অবসাদ-গুলো ঝরা পাতার মতো সব ঝরে যায়।

দুঃশা ॥ যাতে কাল সকাল বেলায় মাতুল ভালো ভালো দান ফেলতে পারে। মেরে পাশা বারো দুই চোদ্দ! কচেবারো। বুঝলে নটী মাতুল হাতের জাদু দেখাবে আর মাতুলকে তোমার নাচের জাদু দেখিয়ে দাও।

দুর্যো ॥ মাতুলকে খুশী করতে পারলে তোমাকে আমার এই কণ্ঠহার উপহার দেব নটী!

দুঃশা ॥ (দুর্যোধনের কাছে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে) কিন্তু তুমি তো ফুল-উৎসবের দিন এই কণ্ঠহার লুব্ধিকাকে উপহার দেবে বলে কথা দিয়েছো।

দুর্যো ॥ (অনুচ্চকণ্ঠে) নিকুচি করেছে তোর লুব্ধিকার। ওকে তো কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিলেই যদি পালন করতে হয় তাহলে তো ঘরে ঘরে হাজার হাজার ভীষ্মদেব জন্মে যাবে।

[অদূরে ঘোষণা শোনা যায়ঃ শোনো শোনো নগরবাসীগণ
শোনো, আমরা রাজ্য পেলে দেশের দারিদ্র দূর হ'বে।
কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান হবে, অশিক্ষিত
মানুষের মনে জ্বলবে শিক্ষার আলো।
বিবাহে পণপ্রথা রহিত হবে—এ—এ।]

দুর্যো ॥ (ঘোষণা শেষ হবার পর) হা-হা-হা, প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি! পালন করবই এমন কথা ঘোষণায় নেই। (শকুনির উদ্দেশ্যে) অবিশ্যি তোমার হাতদুটো সোনায় বাঁধিয়ে দেব। কথা দিচ্ছি প্রতিশ্রুতি নয়।

শকুনি ॥ সোনায় হাত বাঁধিয়ে কাজ নেই মহারাজ, আমার এই দাঁত দুটো সোনায় বাঁধিয়ে দাও। বড়ো নড়বড় করছে। মৃগ মাংস চর্বণ করতে পারিনা!

দুর্যো ॥ মৃগমাংস কেন মাতুল, দাঁড়াও মহারথীদের মস্তক চর্বণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুঃশাসন, তুমি কাল সায়াহ্নেই আমার নির্বাহী দন্তকার গৌতম ভট্টকে সংবাদ দাও, সে এসে মাতুলের দাঁতদুটো সোনায় বাঁধিয়ে দেবে।

দুঃশা ॥ কিন্তু কাল সায়াহ্নেই যে আমাদের বিজয় উৎসব মহারাজ! লুব্ধিকার নৃত্য আর—

দুর্যো ॥ ওঃ তুমি লুব্ধিকা লুব্ধিকা করেই গেলে! তোমাকে বলে রাখছি দুঃশাসন, ওই লুব্ধিকাই তোমার কাল। আচ্ছা তোমরা কী বলতো, আমাকে দেখেও তোমরা সংযম শিক্ষা করতে পারো না? এই সংযমের অভাবে দেশের যুব সম্প্রদায় অধঃপাতে যেতে বসেছে!

শকুনি ॥ যেতে বসেছে না চলে গেছে? এইতো সেদিন প্রভাতী ঘোষণায় শুনলাম—

[অদূরে ঘোষণা ঃ হস্তিনার রাজপথে জনৈক অপরিচিত যুবকের মৃতদেহ। নগর-কোটালের সন্দেহ এটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।]

শকুনি ॥ (ঘোষণা শেষ হবার পর) একবার ভেবে দেখ মহারাজ, পেটে অন্ন জোটে না কিন্তু মাথায় রাজনীতির পোকা কিলবিল করছে।

দুর্যো ॥ কিছু ভেবোনা মাতুল। ভালোয় ভালোয় পাশাখেলাটা চুকে যাক তারপর ওদের মগজ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করবো।

[অদূরে প্রহর ঘোষণা হবে]

চলো দুঃশাসন আমরা বিদায় হই। তুমি বিশ্রাম করো মাতুল। নটী তুমি মাতুলের অবসাদ দূর করো। আমার এই কণ্ঠহার পুরস্কার। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—প্রতিশ্রুতি!

[দুর্যোধন ও দুঃশাসনের প্রস্থান]

শকুনি ॥ (নটীর প্রতি) তুমি!

নটী ॥ আপনার আদেশের অপেক্ষায় আর্য!

শকুনি ॥ আমার আদেশ! আমি যা আদেশ করব তুমি তাই পালন করবে?

নটী ॥ একবার আদেশ করেই দেখুন।

শকুনি ॥ (সিংহাসনে বসে) নটী নৃত্য প্রদর্শন করো।

[নটী নাচ আরম্ভ করে]

শকুনি ॥ নৃত্য বন্ধ করো।

[নটী নাচ বন্ধ করে]

শকুনি ॥ আবার শুরু করো।

[নটী নাচ আরম্ভ করে]

শকুনি ॥ থামো থামো, বুঝেছি আজকের এই রাত সম্পূর্ণ আমার যদি বলি আকাশের ওই চাঁদটা আমার চাই, তাহলে মহারাজ চাঁদটাকে পেড়ে দিয়ে বলবে—'চাঁদ নাও মাতুল, বলো আর কী চাই?' হাঁ করে কী দেখছ?

নটী ॥ আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না—আমি কি নৃত্য প্রদর্শন করব ?

শকুনি ॥ না। যাও আমাকে একটু একা থাকতে দাও। (নটী গমনোদ্যত) শোনো ! তুমিই নটী অনুপমা ?

নটী ॥ হ্যা প্রভু ! মহারাজ আমাকে এই নামেই ডাকেন।

শকুনি ॥ (কাছে গিয়ে) মহারাজের মুখেই শুনেছিলাম, তুমি খুব সুন্দরী। আজ দেখলাম—সত্যিই তুমি অনুপমা।

নটী ॥ মহারাজ আমাকে সুন্দর দেখেন তাই আমি সুন্দর। আপনার চোখেও আমি সুন্দর—তাই ধন্য !

শকুনি ॥ তোমার ত্বকে কী লেপন করেছ নটী ?

নটী ॥ চন্দন আর লোধ্ররেণু।

শকুনি ॥ এই চন্দন আর লোধ্ররেণু-মাখা ত্বকের গভীরে একটা বীভৎস কঙ্কাল আছে, জান নটী ? মাত্র সাত দিন তোমার মুখের সামনে কেউ যদি অন্ন না রাখে তাহলে সেই বীভৎস সত্যটা বাইরে বেরিয়ে আসে।

নটী ॥ জানি প্রভু !

শকুনি ॥ বেশ কথাটা মনে রেখো। এখন যাও।

নটী ॥ যথা আজ্ঞা, স্মরণ করলেই আসব।

[নটীর প্রস্থান। প্রহরীদের প্রবেশ]

প্রহরীদ্বয় ॥ প্রভুর জয় হোক !

শকুনি ॥ তোমরা কে ?

খর্ব ॥ আজ্ঞে আমরা হলুম প্রভুর প্রহরী !

শকুনি ॥ সে তো দেখতে পাচ্ছি, কী নাম তোমাদের ?

লম্বো ॥ আজ্ঞে আমার নাম হল গিয়ে লম্বোদর। আর ও হল খর্বহট্ট।

শকুনি ॥ বাবা লম্বোদর, বাবা খর্বহট্ট !

প্রহরীদ্বয় ॥ আদেশ করুন প্রভু !

শকুনি ॥ তোমরা প্রমোদ-প্রাসাদে কেন ?

লম্বো ॥ আজ্ঞে পাহারা দিচ্চি !

শকুনি ॥ পাহারা দিচ্ছ ? কাকে ?

খর্ব ॥ আজ্ঞে আপনাকে !

লম্বো ॥ (অনুচ্চস্বরে) এই বেয়াই কী বলচ ! (শকুনির প্রতি) আমরা হলুম প্রভুর দেহরক্ষী। চারি দিকে প্রভুর শত্রু কিনা তাই পাহারা দিচ্চি।

শকুনি ॥ চারি দিকে আমার শত্রু কোথায় ?

লম্বো ॥ ওই যে পঞ্চপাণ্ডব ! যদি আজ রাত্রে প্রভুকে—না অনেকটা বলে ফেলেচি আর বলা যাবে না।

শকুনি ॥ বুঝেছি, যদি ওরা আমাকে হত্যা করে তাহলে পাশা খেলায় দুর্যোধনের অনিবার্য পরাজয় ! কারণ আমিই তো তার হয়ে পাশা খেলব। তাই পাহারার ব্যবস্থা, তাই না প্রহরী ?

খর্ব ॥ তা ছাড়া কেউ যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তা হলে সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে মহারাজকে সংবাদ দিতে হবে।

লম্বো ॥ দেখবেন প্রভু, এসব কথা যেন মহারাজের কানে না যায়। তাহলে আমাদের গর্দান যাবে!

শকুনি ॥ তোমরা নির্ভয়ে থাকো।

[প্রহরীদ্বয় নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ অনুচ্চস্বরে কিছু আলোচনা করে]

কিছু বলবে বৎস ?

খর্ব্ব ॥ (লম্বোদরের প্রতি অনুচ্চস্বরে) বলনা বেয়াই তুমি-তো বেশ গুছিয়ে বলতে পারো।

শকুনি ॥ কী বলবে নির্ভয়ে বলো ?

লম্বো ॥ আমরা হলুম মুখ্যুশুখ্যু মানুষ, অপরাধ নেবেন না প্রভু! বলছিলুম কি, আমি আর এই বেয়াই, আমাদের এমনই কপাল আজ একযুগ ধরেই প্রাসাদে প্রহরী হয়ে আছি। অথচ দেখুন আমাদের উত্তরগঞ্জের শ্রীবৎস খুড়ো এই ক'বছরের মধ্যে প্রাসাদ-প্রহরী থেকে রাজসভায় বদলি হল, সেখান থেকে গেল ধনভাণ্ডারের রক্ষক হয়ে, কিন্তু আমি আর এই বেয়াই—

শকুনি ॥ বুঝেছি বুঝেছি, তা আমাকে এখন কী করতে হবে ?

খর্ব্ব ॥ আপনি যদি মহারাজকে বলে রাজসভায় কিম্বা—

শকুনি ॥ বেশ বলবো। তবে সবটাই নির্ভর করছে আগামীকাল পাশা খেলার ফলাফলের ওপর।

প্রহরীদ্বয় ॥ প্রভুর জয় হোক, প্রভুর জয় হোক।

লম্বো ॥ যাই প্রভুর আহারের আয়োজন করি।

[উভয়ের প্রস্থান]

শকুনি ॥ (বুকের কাছ থেকে পাশা বের করে) হে পাশা তুমি শকুনির জীবন, শকুনির মরণ। জীবনমরণ হাতের মুঠোয় নিয়ে পথ চলেছি। জানিনা এ পথ কোথায় গেছে—নরকের সীমানায় না স্বর্গের দ্বার প্রান্তে!

[প্রহরীদের সঙ্গে মদনিকার প্রবেশ। মদনিকার হাতে রাজভোগ]

মদনিকা ॥ (রাজভোগ রেখে) রানীমা আপনার জন্যে রাজভোগ পাঠালেন—আহার করুন আর্য।

শকুনি ॥ (রাজভোগের ঘ্রাণ নিয়ে) আঃ ঘ্রাণেই অর্ধ ভোজন! এ ভোগ কে রান্না করেছে সুন্দরী?

মদনিকা ॥ আজ্ঞে আমার নাম মদনিকা!

শকুনি ॥ মদনিকা! খুব সুন্দর নাম তো তোমার। কিন্তু তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি! কোথায় দেখেছি বল তো?

মদনিকা ॥ (লজ্জায় মাথা নতকরে) আজ্ঞে কারাগারে দেখেছেন! আমি সেখানেও অন্ন পরিবেশন করতাম।

শকুনি ॥ কারাগারে! মনে পড়েছে। এক থালা পোড়া ভাত নিয়ে কারাগারে যেতে, আর নীরবে থালাটা মুখের সামনে নামিয়ে রেখে চলে আসতে। আর আজ স্বর্ণথালে তোমারই হাতে এসেছে রাজভোগ!

মদনিকা ॥ ক্রুদ্ধ হবেন না আর্য, আমি কেবল আদেশ পালন করি!

লম্বো ॥ আর্য মদনিকা বড়ো ভালো। আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। ওর মা ছিল আমার মামীশাশুড়ির ভাসুরঝি—সেই সুবাদে ও আমার—

মদনিকা ॥ তুমি থামবে লম্বোদর! (শকুনির প্রতি) আপনি আহারে বসুন আমি চামর ব্যজন করি। (হাতে চামর তুলে নেয়) মহারাজের পাচক নিজের হাতে আপনার জন্যে রান্না করেছে।

শকুনি ॥ মহারাজের পাচক! রাজভোগ! আচ্ছা আমি আহারে বসছি। কিন্তু আমি একান্তে আহার করব তোমরা এখন যাও।

[প্রহরীদ্বয় ও মদনিকার প্রস্থান]

শকুনি ॥ আঃ রাজভোগ! দুর্যোধন যে ভোগ রোজ খায়। কেবল আজ রাত্রে আমি খাচ্ছি! আমি কেবল এক রাতের রাজা। মহারাজ শকুনি হা-হা-হা! এই আমার রাজসভা, আমার সভাসদ, আমার নর্তকী, আমার কিংকরী, আমার রাজসিংহাসন—হা-হা-হা।

[সহসা ছায়ামূর্তির বেশে শকুনির পিতার প্রবেশ]

কে? ওঃ পিতা! তোমার শরীর ভালো তো?

ছায়ামূর্তি ॥ ভালো আর কোথায় বৎস, না বেঁচে মরে থাকা! ও কী খাচ্ছ বৎস?

শকুনি ॥ রাজভোগ, দুর্যোধন পাঠিয়েছে। কাল প্রত্যুষে পাশা খেলতে হবে কিনা তাই আজ রাজভোগ খাওয়াচ্ছে।

মূর্তি ॥ (স্বর্ণথালের এক দিকে ইঙ্গিত করে) এটা কী বৎস?

শকুনি ॥ মৃগমাংসের পলান্ন।

মূর্তি ॥ এটা?

শকুনি ॥ এটা—পরমান্ন।

মূর্তি ॥ এটা ?

শকুনি ॥ রোহিত মৎস (ঘ্রাণ নিয়ে) না রেঁধেছে ভালোই।

মূর্তি ॥ এ গুলো কী বৎস ?

শকুনি ॥ পিষ্টক।

মূর্তি ॥ আর এ গুলো ?

শকুনি ॥ কোন্‌গুলো পিতা ?

মূর্তি ॥ এই যে স্বর্ণথালের ঈশান কোণে দেখা যাচ্ছে ?

শকুনি ॥ ও গুলোর নাম জানিনা পিতা—কোনদিন চোখেও দেখি নি।

মূর্তি ॥ আর এ গুলো এই যে স্বর্ণথালের নৈঋর্ত কোণে দেখাযাচ্ছে ?

শকুনি ॥ (চীৎকার ক'রে) যাও, যাও বলছি, আমাকে বিরক্ত কোরো না, আমি ক্ষুধার্ত—এখন আহার করব।

[ছায়ামূর্তি গমনোদ্যত]

শোনো পিতা, আমার ওপর রাগ কোরো না। আজ আমার মনটা খুব বিক্ষিপ্ত। কাল প্রত্যুষে আবার পাশা খেলতে হবে। সেই পাশা যা তোমার বুকের কাছে লুকিয়ে নিয়ে কারাগারে গিয়েছিলে। সেখানেই আমার পাশা খেলার হাতে খড়ি। খেলার সব কৌশল শিখিয়ে এক দিন এই পাশা তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছো। যা কাল হাতে নিয়ে আমি নাচাব-বাজাব। (হঠাৎ উত্তেজিত) পিতা! তুমি আজ রাত্রে কেন এলে ?

রাজভোগ আমি মুখে তুলতে পারব না। এ অন্ন আমার কাছে বিষ! প্রহরী!

[ছায়ামূর্তি চলে যায়। প্রহরীদের প্রবেশ]

প্রহরীদ্বয় ॥ আদেশ করুন প্রভু!

শকুনি ॥ বৎসগণ কাছে এসো। তোমরা রাজভোগ খাবে? কী অমন ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? খাবে—রাজভোগ!

খর্ব্ব ॥ প্রভু কী বলতে চান বুঝতে পারছি না!

লম্বো ॥ আমরা সামান্য লোক আমাদের সঙ্গে ছলনা করবেন না প্রভু।

শকুনি ॥ আমি ছলনা করছি না প্রহরী। তোমরা যদি রাজভোগ খেতে চাও তাহলে নিয়ে যাও এ স্বর্ণথালা দুজনে ভাগকরে খাও।

খর্ব্ব ॥ আপনি আহার করবেন না প্রভু?

শকুনি ॥ আমার শরীর ভালো নেই!

লম্বো ॥ রাজবৈদ্যকে সংবাদ দেব?

শকুনি ॥ রাজবৈদ্য ডাকার প্রয়োজন নেই। নিয়ে যাও স্বর্ণথালা জীবনে অন্তত এক দিনের জন্যে রাজভোগের স্বাদ গ্রহণ করো।

খর্ব্ব ॥ প্রভু আমরা সামান্য মানুষ আমাদের প্রলুব্ধ করবেন না!

লম্বো ॥ রাজভোগ খাওয়া তো দূরের কথা মনে ভাবলেই যে পাপ হয় প্রভু।

শকুনি ॥ পাপ! কে বলেছে? এই প্রমোদ-প্রাসাদের প্রহরী তোমরা, কতোদিন নিদ্রাহীন চোখে দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে কতো সুন্দরী নটীর নূপুরের ধ্বনি শুনেছ। মনে লেগেছে সুরের আগুন। সত্যি করে বল তো প্রহরী কোনো দিন তোমাদের বুকের রক্ত নেচে ওঠে নি! কোনো দিন মনে হয় নি এমনই একটা প্রমোদ-প্রাসাদের অধিকারী হতে। যে প্রাসাদে তোমারই অঙ্গুলি-সংকেতে নটী নাচবে গাইবে, কেবল তোমার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে!

খর্ব ॥ আমাদের এমন কথা শোনাবেন না প্রভু। আমরা ছা-পোষা মানুষ। সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন দিতে পারলেই ধন্য। তার বেশি কিছু চাই নে।

লম্বো ॥ আমার ছেলেটা আজ কদিন ধরে 'মেঠাই খাব' 'মেঠাই খাব' বলে বায়না ধরেছে তার সেই সামান্য সাধটুকুই মেটাতে পারি নি। উপরন্তু তার গণ্ডে আজ কয়েকটি চপেটাঘাত করেচি।

শকুনি ॥ আচ্ছা প্রহরী তোমার কোনোদিন ইচ্ছে করে না, সেই ছেলেটা কোনো একটা দেশের রাজা হয় সূতপুত্র কর্ণের মতো হঠাৎ! তারপর মনে করো তারও অভিষেক হবে, আর সেই অভিষেক-সিক্ত শির মাটিতে ঠেকিয়ে কর্ণের

মতো সেও তোমাকে প্রণাম করবে। বলবে, বাবাগো ছোটোবেলায় কতো—'মেঠাই খাব' 'মেঠাই খাব'—বলে বায়না করেছি। কতো লাথিচড় খেয়েছি, দেখ আজ আমি রাজা! স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়, সত্যি আমি রাজা এই দেখ মাথায় আমার রাজমুকুট!

প্রহরীদ্বয় ॥ (দুহাতে কান চাপা দিয়ে) এ সব কথা শোনা পাপ, আমাদের প্রলুব্ধ করবেন না প্রভু! আমরা ছাপোষা সামান্য মানুষ, যা শুনলে অমঙ্গল হয় তা না শোনাই ভালো।

শকুনি ॥ শোনো অন্তত এক দিন—তোমরা রাজভোগের স্বাদ গ্রহণ করো। আজকের এই রাত আর কোনো দিন ফিরে আসবে না প্রহরী। এ রাত শকুনির রাজা হবার রাত। তোমরা আমার সভাসদ! নাও এ স্বর্ণথালা।

খর্ব ॥ প্রভুর অসীম দয়া! কিন্তু ধরুন যদি মদনিকা জানতে পারে আমরা রাজভোগ খেয়েছি, আর যদি সে কথা যায় মহারাজের কানে, তা হলে যে আমাদের গর্দান যাবে প্রভু!

শকুনি ॥ না। কেউ জানতে পারবে না। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের কোন ভয় নেই।

[খর্বহট্ট নিজের ভল্লটা লম্বোদরের হাতে দিয়ে রাজভোগের থালাটা তুলে, নেয় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মিষ্টান্ন নিজের পোশাকের মধ্যে চালান করে দেয়। লম্বোদর কিছু করতে পারছে না, কারণ তার দুহাতে দুটো বল্লম। তারা বাইরে চলে যায়।]

শকুনি ॥ আজ রাত্রে এরাই আমার সভাসদ। হায় সামান্য মানুষ! তোমরা কতো সুখী! তোমাদের জীবনে যুদ্ধ নেই, পাশাখেলা নেই, কতো ছোটো ছোটো আশা—তাই নিয়ে বাঁচা আর মরা। যদি এমনই একটা নিরুদ্বেগ জীবন পেতাম! একটা ছোটো ঘর, একরত্তি উঠোন, উঠোনের প্রান্তে তুলসীমঞ্চ। যেখানে বধূরা সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালে। দুরন্ত ছেলেরা মেঠাই খাবার বায়না করে। না না আমি এসব কী ভাবছি! আমি তো সামান্য মানুষ নই, আমি অক্ষবিদ্ শকুনি। আমাকে আগামীকাল প্রত্যূষে এই মহাভারতের নতুন ইতিহাস রচনা করতে হবে।

[উত্তেজিত প্রহরীদের প্রবেশ]

লম্বো ॥ প্রভু সর্বনাশ হয়েছে!

খর্ব্ব ॥ সবে পরমান্নটা মুখে দিয়েচি এমন সময়—

লম্বো ॥ আমিই আগে দেখেচি প্রভু কথাটা মনে রাখবেন। সবে পরমান্ন ভোগটা শেষ করে রোহিত মৎসের মুড়োটা কায়দা করতে যাচ্চি—এমন সময় দেখি—

খর্ব্ব ॥ আহা তুমি তো উত্তর দিকে মুখ করে খাচ্চিলে তাই আগে দেখেচো। আমি যদি ওদিকে বোসতুম আমিই আগে দেখতে পেতুম।

লম্বো ॥ তর্ক বাদ দাও, আমার মনে হয় এক বার মহারাজকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। হয়তো পুরস্কার ও মিলতে পারে, নিদেন একটা প্রতিশ্রুতি!

শকুনি ॥ তোমাদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কী দেখে তোমরা অমন করে ছুটে এলে? কোনো ছায়ামূর্তি কোনো দানব অথবা কোনো—

লম্বো ॥ বলচি প্রভু, আমরা দেখলাম বাসুদেব কৃষ্ণ এই দিকে আসচেন।

শকুনি ॥ বাসুদেব কৃষ্ণ আসছেন এই দীন শকুনির কাছে! যাও প্রহরী তাঁকে সসম্মানে এখানে আহ্বান করে আনো। আর শোনো—আমি চাই কৃষ্ণের আগমন সংবাদ গোপন থাক। এই নাও তোমাদের পারিতোষিক।

[স্বর্ণমুদ্রা প্রদান]

প্রহরীদ্বয় ॥ স্বর্ণমুদ্রা! স্বর্ণমুদ্রা! বেশ তাই হবে প্রভু!

[প্রহরীদের প্রস্থান]

শকুনি ॥ হে রজনী, হে যাদুকরী রজনী তুমি আজ শকুনিকে রাজা করেছ। আর কৃষ্ণের আগমনে তার অভিষেক সম্পূর্ণ হল। হে মহাকাল! তুমি সাক্ষী থেকো— দ্যূতক্রীড়ার পূর্বরাত্রে উপেক্ষিত শকুনি বাসুদেব কৃষ্ণের নিদ্রাহরণ করেছে।

[কৃষ্ণের প্রবেশ। সঙ্গে প্রহরী। শকুনি প্রহরীদের বাইরে যাবার নির্দেশ দেয়]

এসো এসো কৃষ্ণ, সর্বাঙ্গীণ কুশল তো?

কৃষ্ণ ॥ আমার অভিবাদন গ্রহণ করো মাতুল। আমরা কুশলেই আছি।

শকুনি ॥ আজ তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ ॥ ক্লান্ত ? হতে পারে, দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ। তারপর আবার হস্তিনা—এতোটা পথ। তার ওপর অগণিত রথের ভিড়ে আমি অনেকক্ষণ আটকে ছিলাম—হয় তো সেই কারণেই ক্লান্ত !

শকুনি ॥ রাজধানীতে আজ এতো রথের ভিড় কেন বল তো ?

কৃষ্ণ ॥ সে কথা তো তোমার অজানা নয় মাতুল। আজ সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে হস্তিনার দিকে। অথবা কৌরবসভার দিকে। যে-সভায় বসে আগামীকাল প্রত্যুষে তুমি মহাভারতের রাজনৈতিক চেহারাটা পাল্টে দেবে। তোমার সেই খেলা দেখার জন্যে এতো ভিড়, এতো রথী, আর রথজট।

শকুনি ॥ আমি সামান্য মানুষ কৃষ্ণ, দিন আনি দিন খাই, নায়ক হবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই।

কৃষ্ণ ॥ হা-হা-হা। সামান্য মানুষ ! হয়তো এক দিন তাই ছিলে। দুদিন পরে আবার তাই হবে। কিন্তু আজ তুমি সামান্য নও। ঠিক এই মুহূর্তে অর্জুন কিম্বা কর্ণের চেয়েও তুমি বিখ্যাত ব্যক্তি, আলোচিত এবং বিতর্কিত—হয়তো আমার চেয়েও। এই তো সেদিন দ্বারকা ত্যাগের পূর্বে রুক্মিণীর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি, সে উদ্যানবীথিকায় বসে সখীদের সঙ্গে গল্প করছে। কার গল্প জান মাতুল ? তোমার।

শকুনি ॥ আমার গল্প ?

কৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ! রুক্মিণী তার হাতের পাশা চেলে সখীদের বোঝাচ্ছেন শকুনিমামার জাদু-পাশা মাটিতে পড়েই কেমন উল্টে গিয়ে ঠিক দান ফেলে। মাতুল তুমি আজ সারা দেশের প্রবাদপুরুষ, তোমাকে দেখে ঈর্ষা হয়।

শকুনি ॥ তাই বুঝি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হস্তিনায় এসে সেই বিখ্যাত বিতর্কিত লোকটিকে দেখতে ছুটে এলে?

কৃষ্ণ ॥ কেবল দেখতে নয় মাতুল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি?

শকুনি ॥ আমাকে নিতে? কোথায় নিয়ে যাবে?

কৃষ্ণ ॥ যেখানে বলবে। যদি বলো স্বর্গে তো—স্বর্গে! যদি বলো নরকে-তো—নরকে! না না ভয় পেওনা। আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

শকুনি ॥ প্রস্তাব! দ্যুতক্রীড়ার পূর্বরাত্রে কী এমন প্রস্তাব? যার জন্যে ক্লান্ত শরীরে দুর্যোধনের প্রমোদ-প্রাসাদে তোমাকে গোপনে ছুটে আসতে হল?

কৃষ্ণ ॥ মাতুল লোকে বলে তুমি জাদুকর! পাশা তোমার আজ্ঞাবহ! কিন্তু আমি জানি এ-তোমার প্রতিভা। বহু দিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছ!

শকুনি ॥ ঠিক বলেছ কৃষ্ণ, তুমি বিজ্ঞ তাই লোক-প্রবাদ বিশ্বাস কর না। সত্যি আমি জাদুকর নই অক্ষবিদ্। (এর পর কিছুটা আপন মনে) বহুকাল কারাগারে

বসে পিতার কাছে পাশা খেলার কৌশল শিখেছি। চালে একটু ভুল হলেই হাতের আঙুলে পিতা পদাঘাত করতেন। অসহ্য যন্ত্রণায় আঙুলগুলো টনটন করে উঠত। জল আসত চোখে। পিতা সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—বৎস পাশা তোমার ঈশ্বর, ঈশ্বর লাভের জন্যে একটু কষ্ট করবে না! এক দিন আমি কষ্ট করেছি। তাই আজ দ্যূতক্রীড়ায় অপরাজেয়!

কৃষ্ণ ॥ জানি মাতুল দ্যূতক্রীড়ায় তুমি বিধাতার মতো অপরাজেয়। কিন্তু আগামীকাল যদি তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়? মানে আমরা যদি কৌশলে তা মিথ্যা প্রমাণিত করি?

শকুনি ॥ অসম্ভব! রণক্ষেত্রে কর্ণার্জুনের পরাজয় হতে পারে, তবু পাশাখেলায় শকুনির পরাজয়—অসম্ভব বাসুদেব।

কৃষ্ণ ॥ জানি! কিন্তু আমি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার প্রস্তাব এনেছি মাতুল, আমাকে নিরাশ কোরো না।

শকুনি ॥ এ প্রস্তাব কার? মানে কার কাছ থেকে এসেছে?

কৃষ্ণ ॥ কথা দাও গোপন থাকবে!

শকুনি ॥ বেশ, কথা দিলাম।

কৃষ্ণ ॥ এ দ্রৌপদীর প্রস্তাব। দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করতে না পেরে কৃষ্ণা আমাকেই দূত করে তোমার কাছে

পাঠিয়েছে। এই দেখ চুক্তিপত্র।

[চুক্তিপত্র দেখায়]

শকুনি ॥ এ প্রস্তাবে রাজি হবার অর্থ কী জান ?

কৃষ্ণ ॥ জানি, তোমার গৌরবহানি। কিন্তু তার বিনিময়ে—

শকুনি ॥ বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পাব—এই তো ?

কৃষ্ণ ॥ না কেবল অর্থ নয়, তার সঙ্গে পাবে অর্ধেক রাজত্ব আর পঞ্চপাণ্ডবের বন্ধুত্ব।

শকুনি ॥ কিন্তু এ সর্তে পঞ্চপাণ্ডব রাজি হবে কেন ? বিশেষত আমি যখন পরাজিত।

কৃষ্ণ ॥ রাজি হবে, যখন তারা শকুনির পরাজয়রহস্য জানবে। বিশেষত দ্রৌপদীর অনুরোধ ওর স্বামীরা উপেক্ষা করতে পারে না।

শকুনি ॥ তুমি কী বলছ বাসুদেব ? অন্যদের কথা না হয় বাদ দিলাম, এই ছলনার আশ্রয় নিয়ে যুধিষ্ঠির জয়ী হবে! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির! না না, তুমি আমাকে পরিহাস করছ।

কৃষ্ণ ॥ এ পরিহাসের সময় নয় মাতুল, তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার পরিহাসের সম্পর্কও নয়।

শকুনি ॥ সেই কারণেই বিস্মিত হচ্ছি।

কৃষ্ণ ॥ শোনো মাতুল, যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র হলেও—মানুষ। হাতের মুঠোয় বিজয়লক্ষ্মী পেলে সেও ধর্মাধর্মের সূক্ষ্মবিচার ত্যাগ করে কৃষ্ণার কথাই মেনে নেবে। আমি স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ তোমাকে কথা দিচ্ছি

মাতুল দ্যূতক্রীড়ার পর সন্ধির সব সর্তই পালিত হবে। এই নাও কৃষ্ণার সন্ধিপত্র—সাক্ষী হিসাবে আমারও স্বাক্ষর আছে। (সন্ধিপত্র প্রদান)

শকুনি ॥ (সন্ধিপত্র হাতে নিয়ে) না কৃষ্ণ যে কাজে যুধিষ্ঠিরের ধর্মহানি আমার গৌরবহানি তুমি আমাকে সে কাজ করতে বোলো না।

কৃষ্ণ ॥ মনে নেই একটা সামান্য কারণে এই দুর্যোধন একদিন তোমাদের কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল ?

শকুনি ॥ তুমি জান আমাদের বন্দীত্বের কারণ ?

কৃষ্ণ ॥ জানি—জানি মাতুল, এক প্রাচীন সংস্কারের বশে তোমার পিতা গান্ধারীদেবীর বিয়ের আগেই এক বৃক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রমতে তাঁর বিয়ে দেন--এতে নাকি বৈধব্যের রিষ্টিযোগ খণ্ডন হয়।

শকুনি ॥ হ্যাঁ, বিয়ের কিছুদিন পরে সেই বৃক্ষের মাথায় বাজ পড়ে। এক দৈবজ্ঞের নির্দেশে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পরে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আমার ভগ্নীর বিবাহ হয়। এটাই হল দুর্যোধনের ক্রোধের কারণ। সে নাকি যখন তখন ভীমকে পবননন্দন বলে সম্বোধন করলে ভীমও তাকে বৃক্ষনন্দন বলে পরিহাস করত। সেই অভিমানে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন—

কৃষ্ণ ॥ সেই অবিচারের প্রতিশোধ নেবে না মাতুল ?

শকুন ॥ যে কথা আমি কোনো দিন ভুলতে পারিনা সে কথা আমাকে আবার স্মরণ করাচ্ছ কেন ?

কৃষ্ণ ॥ স্মরণ করাচ্ছি কারণ কাল প্রত্যুষেই তোমার হাতে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ আসবে।

শকুনি ॥ হ্যাঁ – প্রতিশোধ নেব বলেই অন্ধকার কারাগারের অজস্র মৃত্যুকে দু হাতে সরিয়ে আমি বেঁচে আছি।

কৃষ্ণ ॥ সেই সুযোগ এখন তোমার হাতের মুঠোয়!

শকুনি ॥ বল আমাকে কী করতে হবে?

কৃষ্ণ ॥ বিশেষ কিছুই না, কেবল—

শকুনি ॥ কেবল স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ, তাও যুধিষ্ঠিরের কাছে! আমি পাশা চালব—'পাশা কচে্‌বারো' পাশা আমার কথা শুনবে না। আমি বলব পাশা – 'বারো দুই চোদ্দ' পাশা আমার কথা শুনবে না! তা কখনও হয়? পাশার এই সব দান ফেলার জন্যে আমার হাতের এই আঙুল তৈরি হয়েছে। পিতার পদাঘাতে এর হাড় ভেঙে দুমড়ে তৈরি হয়েছে ইন্দ্রের বজ্র।

কৃষ্ণ ॥ মনে রেখো আমাদের সর্তে রাজি হলে তুমি পাবে অর্ধেক রাজত্ব, আর দুর্যোধনকে বনে পাঠিয়ে নেবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ।

শকুনি ॥ আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না বাসুদেব, হয় তো আমি এক্ষুনি তোমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাব! আমাকে আজকের এই রাতটা ভাববার সময় দাও।

কৃষ্ণ ॥ বেশ ভাবো, সারা রাত ভাবো। কিন্তু কেমন করে জানব আমাদের প্রস্তাবে তুমি রাজি কি না?

শকুনি ॥ (খানিক ভেবে) শোনো আমার পেটিকায় দুটো পোশাক

আছে। একটার রঙ শ্বেত অন্যটা কৃষ্ণবর্ণ। কাল প্রত্যুষে দ্যূতসভায় যদি আমার পরণে দেখ শ্বেত বর্ণের পোশাক তা হলে বুঝবে আমি তোমাদের প্রস্তাবে রাজি। আর তা যদি না দেখো তা হলে বুঝবে আমি দুর্যোধনের।

কৃষ্ণ ॥ বেশ তাই হবে, অনেক রাত হল আজ তাহলে চলি মাতুল। দ্যূতসভায় আবার দেখা হবে। মিত্ররূপে অথবা শত্রুরূপে! (কোলাকুলি) অবিশ্যি—আমি আশা করব কাল প্রত্যুষে তোমার পোশাকের রঙ হবে সাদা।

[প্রস্থান]

শকুনি ॥ (আপন মনে) এবার সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে আমি অসাধারণ। আমি বিরাট। আমার মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে ওই দূর আকাশের গায়ে। আমার পেছনে সূর্যের ছটা। সবাই আমাকে দেখছে আর বলছে—'ওই দেখো মহান শকুনি, অক্ষবিদ্ শকুনি, ওই দেখো অপরাজেয় শকুনি।' অপরাজেয় শকুনি—? কিন্তু যদি সন্ধিসর্তে রাজি হই—

[সহসা প্রহরীদের প্রবেশ]

খর্ব্ব ॥ প্রভু রাত হল আপনার নিদ্রার আয়জন করি?

শকুনি ॥ হায় নিদ্রা! আজ শকুনির চোখে নিদ্রা নেই প্রহরী, আজ আমার জীবনে এক আনন্দময় নিদ্রাহীন রাত। আকাশের চাঁদ কী ঘুমোয়? আজ আমি আকাশের চাঁদ। সকলের কামনার বস্তু। আমাকে সবাই কাছে

ডাকছে বলছে—'এসো, মাছ কাটলে মুড়ো দেব, গাই দুইলে দুধ দেব।' শুনে আমার মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে চাঁদের হাসি। আচ্ছা প্রহরী বল তো—চাঁদের মুখে অমন চতুর হাসি কেন ?

লম্বো ॥ আমরা মুখ্য মানুষ অত জ্ঞান আমাদের নেই প্রভু।

শকুনি ॥ (উপবেশন করে) শোনো এদিকে এসো। তোমাদের একটা গল্প বলি। এসো কাছে এসো। আরও কাছে। আজ আমার রাজসভায় তোমরাই তো সভাসদ। এক দিন আমরা কারাগারে বন্দী ছিলুম। আমি, আমার পিতা, আর অনেকগুলি ভাই। এক দিন হল কি, খিদের জ্বালায় অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ছোটোবেলায় আমাদের মা বলতেন—'ক্ষিদের জ্বালা বড়ো জ্বালা কখনো করে গা থ্যান থ্যান—কর্ণে লাগে তালা।' সেই ক্ষিদের জ্বালা ! গবাক্ষ দিয়ে তাকাতে চোখে পড়ল চাঁদের আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। যেন একটা নতুন পৃথিবী। দেখলাম আকাশের গায়ে মস্তবড়ো একটা স্বর্ণথালার মতো চাঁদটা আমাকে দেখে মিটি মিটি হাসছে। চতুর হাসি। এক সময় মনে হল চাঁদটাই ইতিহাসের নীরব সাক্ষী ! তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ ?

প্রহরীদ্বয় একত্রে ॥ আমরা মুখ্যু মানুষ। অত জ্ঞানের কথা

বুঝি না প্রভু। একটু সহজ করে বলুন।

শকুনি ॥ আমিও তোমাদের মতো বয়সে বুঝতুম না। সারা দিন শিকার করতুম, বীণা বাজিয়ে গান করতুম আর—

লম্বো ॥ প্রভু আপনি গান করতেন ?

খর্ব্ব ॥ বীণা বাজিয়ে ?

শকুনি ॥ কেন অক্ষবিদকে বুঝি গান করতে নেই ? ভালবাসতে নেই ? জান প্রহরী আমারও একদিন কৈশোর-যৌবন ছিল। সুন্দরীর চোখের দিকে তাকালে আমারও পায়ের তলায় মাটি কেঁপে কেঁপে উঠত !

খর্ব্ব ॥ দেখছ বেয়াই আর্য ঠিক আমাদের মতো কথা বলছেন !

লম্বো ॥ জানেন আর্য ! আমি আর খর্ব্বহট্ট বেয়াই বয়েসকালে কী না করেচি ! আমি বাজাতাম বেয়াই গাইতো, আবার বেয়াই বাজাতো আমি গাইতাম।

শকুনি ॥ কী গান গাইতে তোমরা প্রহরী ?

খর্ব্ব ॥ সে কতো গান। শিবনাচন, ফসল কাটন, হলুদকোটা বরণবাটা। এদের মধ্যে শিবনাচনটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। তোমার মনে নেই বেয়াই ?

লম্বো ॥ মনে নেই আবার—(গান করে)

তা থৈ তাতা থৈ
নাচে শিব নাচে ঐ
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমিতাং

আসমান মাটি গাঙ্
সঙ্গে রঙ্গে নাচে ঐ।
এ ধরণী থরথরে উথালি পাথালি করে
তবু শুনি অন্তরে বাজে মাভৈ।
তা থৈ—তাতা থৈ।

খর্ব্ব ॥ আর সেই ফসল কাটার গান!

[গান করে]

ধান কাটি কাটি ধান ধান কাটি
আদরে সোহাগে বাঁধি আঁটি আঁটি।
ধান কাটি কাটি ধান ধান কাটি।
উঠান ভরিয়া সোনা দেয় মাটি
ধান কাটি কাটি ধান ধান কাটি।
হাজার প্রাণের এ জীয়ন কাঠি
ধান কাটি কাটি ধান ধান কাটি ॥

শকুনি ॥ সাধু সাধু! এখন তোমরা আর গান করো না প্রহরী?

খর্ব্ব ॥ না প্রভু!

শকুনি ॥ কেন?

লম্বো ॥ আমরা গানকে বিক্রি করে দিয়েছি আর্য। যেদিন মহারাজের এই প্রমোদ-প্রাসাদে চাকরি পেলাম সেদিন থেকেই আমাদের গানের ছুটি।

[উভয়ের গান]

পরাণ করে ধুকু পুকু
সুরের পাখি শুকু শুকু

পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথা যায় রে—হায়রে !
পেটের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
কেবা গুণিন কেবা নিপুণ
অসময়ে মঞ্জরী শুকায় রে—হায়রে !

শকুনি ॥ কী মিষ্টি গলা তোমাদের প্রহরী ! আমি যদি কখনও রাজা হই আমার সভার প্রহরী নয়, তোমাদের আমি গায়কের পদে বসাব। এখন যাও বিশ্রাম কর।

[প্রহরীদের প্রস্থান]

(স্বগত) আজকের এই রাত সম্পূর্ণ আমার। যেমন আকাশটা চাঁদের একার। আচ্ছা যদি এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হয় ! সেই অনেক দিন আগে অন্ধকার কারাগারে বসে যে মৃত্যুকে ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করেছিলাম। সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করেছিলাম তার হিমশীতল হাতের স্পর্শ ! আজ যদি তেমনি করে সে এক বার আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। শৈশবে হারানো জননীর মতো ধীরে ধীরে আমার নাম ধরে ডাকে ? হা-হা-হা তাহলে শকুনির নয়, মৃত্যু হবে দুর্যোধনের। বেচারা দুর্যোধন, প্রমোদ-প্রাসাদে এনে এতো যত্নআত্তি করল, রাজভোগ খাওয়ালো, সুন্দরী নটীর নাচ দেখালো, দাঁত বাঁধানোর প্রতিশ্রুতি দিল— আর বুড়োটা কিনা প্রমোদ-প্রাসাদে বসে পাশা খেলার আগের দিন রাত্রে—না না এখানে বসে মৃত্যুর কথা ভাবতে নেই ! আনন্দ করো আনন্দ করো শকুনি, আজ

তোমার আনন্দের রাত যে রাতে এক মাত্র তুমিই রাজা! যাই সুরাকক্ষে গিয়ে এক পাত্র মৃতসঞ্জীবনী পান করে আসি।

[শকুনি বাইরে যায়। মঞ্চের আলো কমে আসে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না। পর্দা তোলাই থাকে। এখানে বিরতি দেওয়া যেতে পারে।]

[মঞ্চে আলো পড়ে। শকুনি স্খলিত পদে মঞ্চে ঢোকে]

শকুনি ॥ আরে ছ্যা ছ্যা মৃতসঞ্জীবনী সুরা না শীতল বারি! বসে বসে অতটা নির্জলা পান করলুম তবু একটুও নেশা হলো না। প্রহরী!

[প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ]

নটী অনুপমা।

[প্রহরীদের প্রস্থান। অনুপমার প্রবেশ]

নটী ॥ আদেশ করুন প্রভু।

শকুনি ॥ নটী আজ এমন নৃত্য প্রদর্শন করো যাতে আমার যৌবন ফিরে আসে। ভ্রষ্টা নারী যেমন করে তার সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করে ঠিক তেমনি করে আমার যৌবন, আমার পদ্ম পাতার টলমলে দিন গুলোকে আমি হত্যা করেছি। অনুপমা! তোমার নাচে-গানে উড়ে-যাওয়া পাখির মতো সেই যৌবনকে এনে

দাও আমার হাতের মুঠোয়। মাত্র একটি রাতের জন্যে।

নটী ॥ আর্য আপনি কি অসুস্থ ?

শকুনি ॥ অসুস্থ, আমি ? ভাবছ অপরিমিত সুরা পান করে আমি জ্ঞান হারিয়েছি! না-না, আমার কি জ্ঞান হারালে চলে ? জান আগামী কাল প্রত্যুষে আমাকে একটা নতুন ইতিহাস তৈরি করতে হবে ? কর্ণ নয়, অর্জুন নয়, এমন কি কৃষ্ণও নয়, এই শকুনিই সেই ইতিহাস তৈরি করবে।

নটী ॥ কী ইতিহাস আর্য ?

শকুনি ॥ কী ইতিহাস ? হস্তিনার—এই বিশাল ভারতের। কাল প্রত্যুষে আমি রাজাকে পথের ভিখিরী করতে পারি! পথের ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিতে পারি বিশাল সাম্রাজ্য। কী! বিশ্বাস হল না, তবে দেখো এই আমার অস্ত্র (বুকের কাছ থেকে পাশা বের করে)।

নটী ॥ অস্ত্র কোথায় ? এ তো পাশা!

শকুনি ॥ এই আমার অস্ত্র। যা দিয়ে আমি ভাঙাগড়ার খেলা খেলব, ইতিহাস তৈরি করব। এখনও অবিশ্বাস! বেশ তবে প্রত্যক্ষ করো শকুনির ক্ষমতা (পাশার ছক পেতে নটীর হাত ধরে বসিয়ে) পণ করো দ্যূত পণ।

নটী ॥ পণ! আগে আপনি করুন।

শকুনি ॥ আমার পণ হল পাশাখেলায় যদি হারি সারাজীবন তোমার দাসত্ব করব। আর যদি তুমি হারো তাহলে ?

নটী ॥ তা হলে আমিও সারা জীবন আপনার দাসী হয়ে থাকব।

শকুনি ॥ মনে থাকবে পণের কথা ? (শকুনি পাশা চালে)

নটী ॥ থাকবে থাকবে ! আমি আর নতুন করে কী দাসত্ব করব, দাসত্ব আমার অঙ্গের ভূষণ।

শকুনি ॥ পাশা দান ফেল তিন ছয়ে আঠারো। আঠারো ! এ কী ! স্বপ্ন না সত্য ?

নটী ॥ গেল আপনার দান।

[এর পর কিছুক্ষণ নীরবে দুজনে পাশা খেলবে]

শকুনি ॥ পাশা, কথা শোনো, মেরে পাশা পনেরো ! এ কী আবার অন্য দান।

নটী ॥ গেল আপনার দান।

শকুনি ॥ বিস্ময়ের পর বিস্ময়, সামান্য এক জন নটীর কাছে শকুনির পরাজয় হবে ! পিতা ভ্রাতৃগণ, এই জন্যেই কি আত্মদান করে ছিলে ?

নটী ॥ নিন পাশা চালুন।

শকুনি ॥ হ্যাঁ-আমার দান ! পাশা কথা শোনো—কচেবারো।

নটী ॥ (উল্লাস) পরিষ্কার তিন। আর দেখতে হবে না। পণের কথাটা মনে আছে তো ?

শকুনি ॥ (স্বগত) আশ্চর্য ! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার অনিবার্য পরাজয়। হে পাশা ! হে শকুনির পাশা ! তুমি আজ বধির কেন ? দান ফেল বারো দুই চোদ্দ !

নটী । গেল আপনার দান।

শকুনি ॥ (স্বগত) এ সবই কৃষ্ণের চাতুরী। বিদায় কালে সে আমাকে আলিঙ্গন করেছিল। লোকে বলে বাসুদেব জাদু জানে। হয় তো আলিঙ্গন কালে সে আমার দক্ষতা হরণ করেছে। বস্ত্রহরণে, মাখন-চুরিতে যে পটু সে কি আর দক্ষতা হরণ করতে পারে না ! তাই আলিঙ্গনের সময় আমার শরীরটা রোমাঞ্চিত— পুলকিত—কেমন অবশ অবশ হয়ে উঠেছিল।

নটী ॥ কী ভাবছেন ? পাশা দিন, এবার আমার দান।

[পাশা চালার সঙ্গে সঙ্গে নটীর উল্লাস]

খেলা শেষ। আমার জিৎ ! কী ভাবছেন, পণের কথাটা মনে আছে তো ?

শকুনি ॥ আছে। আজ থেকে আমি আপনার দাস !

নটী ॥ এই তোমার ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতার বড়াই কর ? কী, না আমি দেশের নতুন ইতিহাস তৈরি করব। তোমার ইতিহাস রচনার মুখে আগুন। তাই তো ভাবি হৈমন্তিকা কেন নৃত্য প্রদর্শন করতে এল না, 'হাঁটুতে বাত—' বাত না ছাই ! আরো দুয়ো দুয়ো ! ভাবতে ঘেন্না করে এই বিটকেল বুড়োটাকে

আমি প্রভু প্রভু বলে ডেকেচি। নাও এই পেটিকা মাথায় নিয়ে আমার গৃহে চলো।

[নটী একটা কাল্পনিক পেটিকা দেখায়]

শকুনি ॥ এই বিশাল পেটিকা আমি বহন করতে পারব না দেবী।

নটী ॥ মুখে মুখে তর্ক কোরো না দাস। আজ্ঞা পালন করো। পেটিকা মাথায় তোলো।

[শকুনি পেটিকা মাথায় তোলার অভিনয় করে]

এখন আমার গৃহে চলো।

[উভয়ে মঞ্চের বাইরে যায়। মঞ্চের আলো বদলায়। উভয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। শকুনি মঞ্চে পেটিকা রাখার অভিনয় করে]

শকুনি ॥ এই তোমার গৃহ, নটী ?

নটী ॥ নটী! দেবী বলতে পার না ?

শকুনি ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ দেবী। (শকুনি নিজের হাতে কর্ণ মর্দন করে)

[নটী উচ্চাসনে বসে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে]

নটী ॥ এখন বলো তুমি কী কী কাজ করতে পার ?

শকুনি ॥ আমি কোনো বাজে কাজ করতে পারি না, কেবল পাশা খেলতে পারি—আমি অক্ষবিদ্।

নটী ॥ থাক আর বড়াই করতে হবে না, ক্ষমতা জানা আছে। তুমি কুয়ো থেকে জল তুলতে পার ?

শমুনি ॥ আমার কোমরে বাত, ভারি জিনিস তুলতে মানা।

নটী ॥ বাটনা বাটতে পার ?

শকুনি ॥ আজ্ঞে জটাধর কোবরেজ দেখছে।

নটী ॥ আ মোলো কালা নাকি ? বলি বাটনা বাটতে পারো ?

শকুনি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ কানে আমি বরাবরই একটু খাটো ! বাটনা বাটার কথা বলছেন তো ? উটি আমি পারব না ; জটাধর কোবরেজের মানা আছে।

নটী ॥ রান্না করতে পার ?

শকুনি ॥ আজ্ঞে আগুনের তাপে মাথা ঘোরে, তাই তাপ-লাগানো মানা। হ্যাঁ মানা, ওই জটাধর কোবরেজের।

নটী ॥ কিন্তু এবার থেকে তোমাকে যে এই সব কাজই করতে হবে।

শকুনি ॥ এই সব ছোটো কাজ আমি করতে পারব না নটী!

নটী ॥ কী মুখে মুখে তর্ক ! আবার নটী ! দাঁড়াও দেখাচ্চি মজা। এই কে আছিস—

[লম্বোদর ও খর্বহট্টের প্রবেশ]

প্রহরীদ্বয় ॥ আদেশ করুন দেবী।

নটী ॥ এই অবাধ্য দাসকে বেত্রাঘাত করো।

[প্রহরীগণ শকুনিকে বেত মারার অভিনয় করে]

শকুনি ॥ কে আছ আমাকে নটী অনুপমার হাত থেকে উদ্ধার করো। কোথা তুমি মহারাজ দুর্যোধন, কোথা বাসুদেব কৃষ্ণ, দেখে যাও অক্ষবিদ্ শকুনির অবস্থা। কোথায় আমি রাজসভায় বসে পাশা খেলব, তার বদলে আমাকে কূপ থেকে জল তুলে বাটনা বেটে নটীর জন্য রান্না করতে হবে।

[নটীর ইঙ্গিতে প্রহরীদের প্রস্থান]

নটী ॥ বেশ তোমাকে অন্য কাজ দেব। তুমি গান করতে পার ?

শকুনি ॥ এক দিন পারতাম, আজ পারি না !

নটী ॥ তুমি মৃদঙ্গ বাজাতে পার ?

শকুনি ॥ এক দিন পারতাম, আজ পারি না।

নটী ॥ সবই তোমার অতীত, বর্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎ ?

শকুনি ॥ অন্ধকার !

নটী ॥ এমন অপদার্থ দাস নিয়ে আমি কী করব ? যাও তোমাকে আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। এখন গিয়ে কৌরব কিম্বা পাণ্ডবের পদলেহন করো !

[মঞ্চের আলো বদল হয়। পূর্বের আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায় নটী আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে]

শকুনি ॥ (স্বগত) হা-হা-হা এ সব আমার কল্পনা—সত্যি নয়। অতিরিক্ত মৃতসঞ্জীবনী পান করলে এমন কতো মজার মজার কল্পনা আমার মাথায় আসে। ভাব-ছিলাম যদি আজ থেকে আমার দ্যূতক্রীড়ার দক্ষতা চলে যায় তা হলে আমার কী হবে ! কিন্তু তা হবার নয়। নটী !

নটী ॥ আমি আপনারই আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—আছি আর্য। আদেশ করুন।

শকুনি ॥ হায় কপাল ! তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই মনে মনে পাশা খেলছিলাম ! বোসো নটী একটু গল্প করি।

নটী ॥ গল্প করবেন আমার সঙ্গে? সংকোচ হচ্ছে আর্য।

শকুনি ॥ অথচ যদি তোমার কাছে পাশা খেলায় পরাজিত হতাম, তা হলে আমার সঙ্গে বসতেও তুমি ঘৃণা করতে—তাই না?

নটী ॥ বেশ বসছি, আদেশ পালন করাই আমার কাজ।

শকুনি ॥ (পাশে বসিয়ে) বোসো। জান কাল প্রত্যুষে কৌরব-সভায় বসে আমাকে পাশা খেলতে হবে?

নটী ॥ এ কথা কে না জানে আর্য! তাই তো সমস্ত নগর সাজানো হয়েছে। পথের দুধারে তোরণ। মাঝে মাঝে নানা বর্ণের পতাকা। হস্তিনার মানুষ তাকিয়ে আছে দ্যূতসভার দিকে। সকলের মনেই একটা কী হয় কী হয় ভাব! কৌরব না পাণ্ডব, পাণ্ডব না কৌরব! যে জিতবে, মানে যাকে আপনি পাশা খেলে জেতাবেন তিনিই হবেন দেশের রাজা।

শকুনি ॥ আমি কেউ নই নটী। পাশা যাকে জেতাবে তিনিই হবেন দেশের রাজা। অঙ্গ রাজ্যগুলো হবে তার পদানত। যদি যুধিষ্ঠির জেতে তাহলে এই দেশ, রাজধানী, প্রমোদ-প্রাসাদ, এমন কি তুমিও হবে পাণ্ডবের। আর যদি দুর্যোধন জেতে তা হলে—তা হলে বলো, তুমি কী উপহার নেবে? হীরের কর্ণভূষণ? না গজমতির মালা? তুমি যা চাইবে দেব।

নটী ॥ যা চাইব তাই দেবেন আর্য ?

শকুনি ॥ হ্যাঁ তাই দেব। বর চাও, বলো কী নেবে ?

নটী ॥ সত্যি যদি আমাকে বর দিতে চান তাহলে আমাকে মুক্তি দিন। আমি মুক্তি চাই আর্য।

শকুনি ॥ মুক্তি !

নটী ॥ হ্যাঁ আর্য ! এই প্রমোদ-প্রাসাদ আমার সোনার খাঁচা। এই খাঁচা থেকে আমাকে মুক্তি দিন। আমাকে নিজের মতো করে বাঁচতে দিন। নারীর অধিকার নিয়ে ফিরে যেতে দিন সংসারের বুকে।

শকুনী ॥ এই প্রমোদ-প্রাসাদ, উৎসব রজনী, এ সব ফেলে কোথায় যাবে নটী ? সংসারের বুকে ! সংসার মানে একটা জীর্ণ কুটির, অপুষ্টিজনিত কিছু রুগ্ন ছেলে মেয়ে। বন্যা-খরা-মহামারী-দাম্পত্য কলহ, হাড়-জ্বালানে শাশুড়ী অবশেষে বধূ হত্যা !

[অদূরে ঘোষণা শোনা যায়ঃ ভো ভো নরগবাসীগণ শ্রবণ করহ। গতকল্য উদ্‌বন্ধনে শ্রেষ্ঠী পল্লীর যে বধূটি আত্ম-হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহা সত্যই আত্মহত্যা না গুপ্ত বধূ হত্যা সে বিষয়ে নগর কোটালগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকায় বিষয়টিকে রাজসমীপে পেশ করা হইল]

এই তো সংসার ! ভালো লাগবে ?

নটী ॥ সামান্যা এক নারীর ভালো লাগার কথা আপনি কী করে বুঝবেন আর্য ! মুক্তি পেলে আমি ফিরে যাব

আমার ফুল্লশ্রী গ্রামে। পাহাড়ের ঢালে নদীর ধারে যেখানে সবুজ ফসলের খেত হাওয়ায় দোলখায়। নাম না জানা পাখিরা গান করে, আর—

শকুনি ॥ আর কী বলো নটী ?

নটী ॥ সে কথা আমি বলতে পারব না আর্য !

শকুনি ॥ সঙ্কোচ কোরো না। আজকের রাত কোনো দিন ফিরে আসবে না। আর কোনো দিন এমনি করে আমার পাশে বসে তোমাকেও আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে হবে না !

নটী ॥ সে আমার ভালোবাসা আর্য ! আমাদের ফুল্লশ্রী গ্রামের ছেলে, নাম কঙ্ক। রোজ সকাল বেলায় সে ঝর্ণাতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকত। কারণ সে জানত আমি সকাল বিকেল ও পথেই জল আনতে যাই। দুজনের দেখা হত। মুখ ফুটে কিছু বলত না, কঙ্ক ছিল খুব লাজুক ছেলে। আমি ওর চোখ দেখেই বুঝতুম কঙ্ক আমার প্রেমে পাগোল।

শকুনি ॥ তারপর ?

নটী ॥ তারপর আর কিছু নেই। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকতুম, কোথা দিয়ে সময় চলে যেত। নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসতো ছাতিম গাছের ডালে। ভোরের আলো ঝর্ণার জলে মিশে গিয়ে সোনা হয়ে উঠত ঝর্ণার জল। এক সময় কঙ্ক চলে যেত মাঠের কাজে। মূল্যবান সেই মুহূর্তগুলোকে আঁচলে

বেঁধে আমিও ঘরে ফিরে যেতাম। বহুদূর থেকে শুনতাম কঙ্ক গাইছে ঃ

[কঙ্কর কণ্ঠের গান off voice-এ শোনা যায়]

তোমার দীপে জ্বালিয়ে নিলেম
হৃদয়-দীপশিখা।
জানিনে গো এই কী ছিল
আমার ললাটলিখা।
তোমার প্রেমের সে দীপ নিয়ে
আঁধার পথে চলব প্রিয়ে,
সামনে সে কী অমৃতহ্রদ কিংবা মরীচিকা।
তোমার দীপে জ্বালিয়ে নিলেম হৃদয়-দীপশিখা।

শকুনি ॥ নটী কঙ্ককে তুমি খুব ভালো বাসতে ?

নটী ॥ আজও বাসি। কঙ্কই আমার এক মাত্র ভালোবাসা আর্য। আমি যখন নাচি তখন আমার চোখের সামনে একটা সোনার সিংহাসনে যে বসে থাকে সে আর কেউ নয় কঙ্ক! মনকে বলি, মন কঙ্ক তোমার নাচ দেখছে ভালোকরে নাচো। যখন গান করি, তখন আমার গানে কঙ্কের গাওয়া গানের সুর এসে দোল দিয়ে যায়।

শকুনি ॥ ভালোই যদি বাসতে তাহলে তোমাদের মিলন হল না কেন ?

নটী ॥ মিলন! অর্থাৎ বিবাহ ? আর্য আমার পিতা ছিলেন

অতি দরিদ্র কুম্ভকার। এক দিন মহারাজের কর্মচারী আমাদের গ্রামে নটী সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। আমি দরিদ্র পিতার কন্যা হলেও নৃত্যগীত শিক্ষা করেছিলুম। আমার নৃত্যগীতে প্রীত হয়ে রাজকর্মচারী অর্থের বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করে আনে। —আমি নটী হয়ে গেলাম আর্য! (কান্না)

শকুনি ॥ কেঁদো না অনুপমা। কথা দিলাম, কাল যদি পাশাখেলায় জিতি তাহলে তোমাকেই পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে নেব। তার পর তোমার সেই ফুল্লশ্রী গ্রাম, ছোটো নদী, সবুজ ক্ষেত, তোমার কঙ্ক, তোমার মুক্তি!

নটী ॥ আপনার জয় হোক আর্য। আপনি মহান! আপনি—

শকুনি ॥ তিষ্ঠ! অতো জয়ধ্বনি-টনি দিয়ো না। আমি জীবনে কোনো দিন মহৎ কাজ করি নি। এই প্রথম একটা ভালো কাজ করার বাসনা জেগেছে। কাল প্রত্যূষে যখন পাশা খেলতে বসব তখন কোনো রাজ্য নয়, কোনো সম্পদ নয় কেবল অদেখা একটা ছোট্টো নদীর কুলু কুলু ধ্বনি আমার কানে বাজবে, শক্তি যোগাবে, রক্তে আনবে চাঞ্চল্য। যাবার আগে তোমার প্রিয়তমের গাওয়া সেই গানটা এক বার শোনাও।

নটী ॥ ও গান তো এই সোনার খাঁচায় বসে গাইতে পারব না আর্য। বনের পাখিকে বন্দী করলে তার কণ্ঠে কী

আকাশের গান শোনা যায় ?

শকুনি ॥ বেশ, বনে গিয়েই আমি এক দিন বনের পাখির গান শুনব। জীবন-সমুদ্র মন্থনে যেদিন উঠবে হলাহল, বৈচিত্র্যহীন দিনগুলোকে মৃত্যুর মতো শীতল বলে মনে হবে, সেদিন যাব তোমার কাছে, ফুল্লশ্রী গ্রামে, ছোট্টো নদীর ধারে, নীলকণ্ঠ পাখিবসা ছাতিম গাছের তলায়। এখন যাও রাত হল, বিশ্রাম করো।

[প্রণাম করে নটীর প্রস্থান। অদূরে প্রহর ঘোষণা হয়]

(শকুনি গবাক্ষের কাছে গিয়ে) রাত তৃতীয় প্রহর ! তবু শকুনির চোখে ঘুম নেই। সেদিনও ছিল এমনি গভীর রাত চাঁদের আলোয় ধোয়া। সংকীর্ণ গবাক্ষের পথে অতি ক্ষীণ চাঁদের আলো এসে পড়েছে অন্ধকার কারাগারে আমার রাতজাগা চোখে।

[সহসা ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ হয়]

কে ? কে কাঁদে ? ওঃ সৎকুনি তুমি আজও কাঁদছ ! বন্ধ করো তোমার কান্না, —আমি আর সহ্য করতে পারছি না। (ধমকে) বন্ধ করো !

[কান্না বন্ধ হয়]

আমার ভাই সৎকুনি, সবচেয়ে ছোটো—বাবার খুব আদরের ছিল। প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাবা ওর সঙ্গে পাশা খেলতেন। আমার সঙ্গেও খেলতেন—তবে ও ছিল বাবার উপযুক্ত শিষ্য।

বুকের কাছ থেকে পাশা বের করে বাবা আমাদের

দেখিয়ে বলতেন—পাশা নয় এ হল অস্ত্র! এই অস্ত্রই হবে শত্রুর মৃত্যুবাণ।

এক দিন সন্ধ্যে বেলায় বেশ একটা নাটকীয় ব্যাপার হল। সবই বসে আছি। বসে বসে কে কী ভাবছিল জানি না, আমি চোখ বন্ধ করে রাজভোগ খাচ্ছিলাম? হঠাৎ বাবা আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—(পিতার কন্ঠ অনুকরণ করে) হে আমার সন্তানগণ তোমরা তো জান প্রতিদিন আমরা কারাগারে এক জনের খাদ্য পাই। আমি চাই তোমাদের মধ্যে অন্তত এক জন সেই অন্ন গ্রহণ করে বেঁচে থাকো, আর সকলে মৃত্যু বরণ করো। কিন্তু যে বেঁচে থাকবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে পাশা খেলে সে নেবে এই অনাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ। সন্তানগণ বলো, কে নেবে সেই দায়িত্ব?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনও উঠে দাঁড়াল—আমার কনিষ্ঠ সৎকুনি। আমরা দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী! বাবা বললেন বেশ প্রতিদ্বন্দ্বী যখন দুজন, তখন দুজনের মধ্যে পাশা খেলা হোক। যে জিতবে সেই হবে আমাদের প্রতিনিধি।

সেদিন পরাজয় মানে মৃত্যু! অনাহারে—চোখের সামনে এক জনকে আহার করতে দেখে, শুষ্ক অধর লেহন করতে করতে—

যাক খেলার ফলাফলের কথায় আসি, আমি পরাজিত

হয়েছিলাম। আমি পরাজিত, তাই সৎকুনি হল আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। কী নিদারুণ সেই অপমানের জ্বালা! ক্ষুধাতৃষ্ণার চেয়েও ভয়ংকর। আমি নাকি জাদু জানি, তাই অপরাজেয়! কিন্তু সৎকুনি থাকলে কোথায় থাকত এই শকুনি? একটু একটু করে অন্ধকার কারাগারে মরে পচে তৈরি হত একটা নর কঙ্কাল!

(কথা বলতে বলতে গবাক্ষের কাছে গিয়ে) আঃ কী অপূর্ব চাঁদের আলো! সে-দিনও ছিল এমনিই জ্যোৎস্নাধোয়া রাত। সবাই ঘুমচ্ছে। ঘুমচ্ছে মানে ঘুম আর মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

কেবল দেখলাম সৎকুনির চোখে ঘুম নেই। গবাক্ষের সামনে বসে সে ম্লান চাঁদের আলোয় দৃষ্টিকে কেয়া-পাতার নৌকো করে ভাসিয়ে দিয়েছে।

কত দেশ দেশান্তর পেরিয়ে চলে গেছে সেই নৌকো। কত জীবন-মৃত্যু হাসি-কান্নার ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে!

শুনলাম, কী যেন একটা গান গাইছে গুনগুন করে। কী যেন গানটা? হ্যাঁ মনে পড়েছে! আমাদের পরিচিত গান, একদিন আমরা সবাই এ গান গাইতাম। যখন খুব ছোটো ছিলাম, চোখে স্বপ্ন ছিল, শরতের রোদে ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরার জন্যে শরীরটা খুশিতে হয়ে উঠত একটা নাম না জানা পাখি— সেই

তখন আমরা এ গানটা গাইতাম।

তন্ময় হয়ে ও গাইছিল। হঠাৎ নিঃশব্দে বন্যজন্তুর মতো গুঁড়ি মেরে আমি পেছন থেকে তার কন্ঠ চেপে ধরলাম। বাধা দেবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। আমি তখন দুর্জয়, দুহাতে আমার সিংহের শক্তি। এক বার কেবল ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল—'দাদা ছেড়ে দে—বড়ো লাগছে মরে যাব! সেই ওর শেষ কথা, তারপর ধীরে ধীরে শরীরটা নেতিয়ে পড়ল আমারই কোলে—ঘুমন্ত শিশুর মতো।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে শুনতে পেলাম পিতার কণ্ঠস্বর—'বৎস শকুনি তুমিই আমার যোগ্য প্রতিনিধি!'

(অদূরে মন্ত্রপাঠ শোনা যায় ঃ

ক্ষীণীভূতা প্রবৃদ্ধা প্রহরগতবিভা শর্বরী সর্বসুপ্তা
প্রাসাদেষু প্রদীপ্তাঃ প্রশিথিলবিভবাঃ প্রস্ফুরন্তি প্রদীপাঃ
জাগ্রত্যত্যর্থীবীক্ষাঃ প্রহরিসমুদয়াঃ সর্বথাবান্তনিদ্রাঃ
কল্যাণং সন্দধাতুপ্রকটিতসুষমশ্চন্দ্রমাশ্চিত্রলেখঃ।)

ওই শেষ প্রহরের মন্ত্রোচ্চারণ। এবার আমাকে সভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু আমি কার? কৌরবের না পাণ্ডবের?

[এমন সময় মঞ্চের এক দিকে দুর্যোধন এবং অন্য দিকে কৃষ্ণ এসে দাঁড়ায়]

কৃষ্ণ ॥ এক বার ভালোকরে বিবেচনা করো মাতুল, দ্রৌপদীর

প্রস্তাবে রাজি হলে তুমি অর্ধেক রাজত্ব পাবে।

দুর্যো ॥ মাতুল আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য দেব! প্রমোদ-প্রাসাদ দেব, সোনায় দাঁত বাঁধিয়ে দেব, তুমি আমার হয়ে পাশা খেলো।

কৃষ্ণ ॥ মাতুল তুমি হবে পঞ্চপাণ্ডবের মিত্র, ত্রিভুবনে তোমার কোনো শত্রু থাকবে না।

দুর্যো ॥ আমি তোমাকে মন্ত্রী করব মাতুল। এই বিশাল দেশের মন্ত্রী হবে তুমি। আমি তো নামেই রাজা, তোমারই অঙ্গুলি সংকেতে চলবে রাজ্যপাট।

কৃষ্ণ ॥ মন্ত্রিত্ব! সে তো দাসত্ব! পাণ্ডবেরা তোমাকে সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

দুর্যো ॥ তোমাকে এক শত নর্তকী দেব মাতুল—সঙ্গে দুঃশাসনের লুব্ধিকা।

কৃষ্ণ ॥ ভুলে যেয়ো না কারাগারের সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা! সেই অনাহার মৃত্যু—

দুর্যো ॥ দরিদ্র দেশে কিছু কিছু মানুষ তো না খেয়ে মরবেই মাতুল। তার জন্যে মন খারাপ করলে চলে!

কৃষ্ণ ॥ আমি তোমাকে বর দেব মাতুল। আমার বরে তুমি অমর হবে।

দুর্যো ॥ আমি তোমাকে প্রমোদ-প্রাসাদে এনে রাজসুখে রেখেছি, রাজভোগ খাইয়েছি, অকৃতজ্ঞ হ'য়ো না—ধর্মে সইবে না।

কৃষ্ণ ॥ তুমি পাণ্ডবের !

দুর্যো ॥ না তুমি কৌরবের !

কৃষ্ণ ॥ তুমি আমাদের—আমাদের—আমাদের !

দুর্যো ॥ না—না—না !

শকুনি ॥ (আর্তনাদ করে) আঃ তোমরা যাও। আমাকে আমার মতো করে একটু ভাবতে দাও।

[কৃষ্ণ ও দুর্যোধন মঞ্চের বাইরে চলে যায়]

ওরা সবাই রাজ্যের লোভে আমার প্রতিভা, আমার অক্ষবিদ্যা ক্রয় করতে চায় ! কিন্তু কিসের বিনিময়ে ? শকুনি তুমি অর্থের বিনিময়ে নিজের প্রতিভা অন্যের হাতে তুলে দেবে ? (কিছুক্ষণ ভেবে) না ! হে পাণ্ডব, হে কৌরব, আমি তোমাদের কারো মনোবাসনাই পূর্ণ করব না। রাজসভায় নয় এই প্রমোদ-প্রাসাদেই আমার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ খেলা দেখাব। প্রহরী !

[প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ]

প্রহরীদ্বয় ॥ আদেশ করুন প্রভু।

শকুনি ॥ তোমরা আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?

খর্ব ॥ অনুরোধ নয় আর্য ; বলুন আদেশ। আদেশ পালন করাই আমাদের কাজ।

শকুনি ॥ বেশ, তাহলে আদেশ।

লম্বো ॥ বলুন, কী করতে হবে ?

শকুনি ॥ তোমাদের হাতের ভল্লদুটো আমার বুকে বসিয়ে দাও এই আমার আদেশ।

লম্বো ॥ কী বলছেন আর্য! এ আদেশ আমরা পালন করতে পারব না।

শকুনি ॥ তার বিনিময়ে তোমাদের কী দেব দেখো! রত্নখচিত আমার এই অঙ্গদ।

খর্ব ॥ আর প্রভাতে যখন মহারাজ এসে দেখবেন আমরা তাঁর মাতুলকে হত্যা করেচি—

লম্বো ॥ অমনি ঘ্যাচাং! গর্দান গেলে অঙ্গদ নিয়ে কী হবে প্রভু?

খর্ব ॥ কিন্তু কেন আপনি ইয়ে—মানে আত্মহত্যা করবেন আর্য? কাল সকালেই কতো বড়ো একটা খেলা! দেশ বিদেশের রাজারা এসে গেছে। অন্ততঃ খেলাটা শেষ করে যান।

শকুনি ॥ আমাকে উপদেশ দিয়ো না প্রহরী। (ইঙ্গিতে লম্বোদরকে ডাকে) এ দিকে এসো। কী যেন নাম?

লম্বো ॥ আজ্ঞে লম্বোদর।

শকুনি ॥ হ্যাঁ মনে পড়েছে, বৎস লম্বোদর কাছে এসো। এই নাও আমার অঙ্গদ তোমাকে দিলাম। খাঁটি সোনা মহারাজের উপহার।

লম্বো ॥ এ্যাঁ! এই দুটোই আমি পাব! (খর্বহট্টের কাছে গিয়ে) হ্যাঁ বেয়াই এ দুটোয় ক'ভরি হবে বলো তো?

খর্ব ॥ খাদ বাদ দিলে ভরি আষ্টেক হবে বোধ করি।

লম্বো ॥ কিন্তু—না আমি পারব না। আমার ভয় করছে। তুমিই দেখ না চেষ্টা করে।

খর্ব্ব ॥ আমি? ক্ষেপেচো! রক্ত দেখলেই আমার মাথা ঘোরে।

শকুনি ॥ বৃথা সময় নষ্ট কোরো না প্রহরী।

লম্বো ॥ না প্রভু আমি পারব না।

[অলংকার প্রদান। শকুনি খর্ব্বহট্টের প্রতি]

শকুনি ॥ তবে তুমিই এসো।

খর্ব্ব ॥ আমি?

শকুনি ॥ হ্যাঁ তুমি—কী যেন নাম?

খর্ব্ব ॥ আজ্ঞে নাম? ভুলে গেছি। আমার নামটা যেন কী বেয়াই? প্রভু বলছিলুম কি আমার না বুকের ব্যামো। বিশ্বাস না হয় বেয়াইকে শুধোন, জটাধর কোবরেজ দেখছে। আমার খুব মাথা ঘুরছে, হয় তো অজ্ঞান হয়ে যাব।

শকুনি ॥ (পদাঘাত করে) দূর হ অপদার্থ। আমি নিজেই—পারব।

খর্ব্ব ॥ প্রভুর জয় হোক! আমার দেহ পবিত্র হল!

লম্বো ॥ (খর্ব্বহট্টের কাছে এসে) এক বার মহারাজকে সংবাদ দেওয়া দরকার।

খর্ব্ব ॥ আমার কিন্তু মনে হয় এক বার রাজবৈদ্য ডাকার প্রয়োজন।

লম্বো ॥ রাজবৈদ্য কেন?

খর্ব্ব ॥ আমার মেজো ভাগ্নেটার ঠিক এমন ধারা হয়েছিল। একটা ডাইনীর পাল্লায় পড়েছিল আর কি। বাপ তো কিছুতেই বে দেবে না তাতেই হল মাথার ব্যামো। সেও যখন তখন বুকে ভল্ল বসাতে যেতো। শেষে জটাধর কোবরেজের ওষুধেই ভালো হল।

লম্বো ॥ বেশ তুমি রাজবৈদ্যের কাছে যাও, আমি মহারাজকে এক বার সংবাদ দিয়ে আসি। কী জানি হয় তো একটা পুরস্কার টুরস্কার মিলতে পারে।

খর্ব্ব ॥ নিদেন একটা প্রতিশ্রুতি ?

[প্রহরীদের প্রস্থান]

শকুনি ॥ কাপুরুষ! (কোমর থেকে ছুরি বের করে) কৃষ্ণ দুর্যোধন তোমরা কেউ আমাকে কাজে লাগাতে পারবে না।

[বুকে ছুরি বসাতে যায়। এমন সময় ছায়ামূর্তি'র প্রবেশ]

ছায়ামূর্তি ॥ তুমি এ কী করছ বৎস ?

শকুনি ॥ আমি আত্মহত্যা করব পিতা !

মূর্তি ॥ আত্মহত্যা ! আগামী কাল প্রত্যূষে পাশা খেলা হবে আর আজ তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ! এ সব বিলাসিতা তোমাকে মানায় না বৎস। এ সব হল রাজা মহারাজাদের খেয়াল। কথায় কথায় হত্যা—না হয় তো আত্মহত্যা।

শকুনি ॥ আমার কী আত্মহত্যা করার অধিকার নেই ?

মূর্তি ॥ না নেই! প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্বে তুমি হাতের একটা আঙুলও কাটতে পার না, কারণ তোমার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু প্রতিজ্ঞা-ঋণে আবদ্ধ।

শকুনি ॥ আমার মৃত্যুই তো প্রতিশোধ নেবে পিতা!

মূর্তি ॥ কিন্তু কথাছিল পাশা খেলেই তুমি অনাহার-মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।

শকুনি ॥ কিন্তু পিতা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোন্ পক্ষের হয়ে পাশা খেলব, কৌরব না পাণ্ডব?

মূর্তি ॥ আমাকে এমন দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না বৎস। বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি লুপ্ত হয়। বরং তুমি সম্মুখে এসে মাথা পেতে দাঁড়াও আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করব। বর চাই? বর নেবে?

শকুনি ॥ কী বর পিতা?

[সহসা প্রহরীদের প্রবেশ। ওরা শকুনির পিতাকে দেখতে পায় না]

লম্বো ॥ আর্য! এই বেয়াই শুধোচ্ছিল—অঙ্গদদুটো সাকুল্যে ক'ভরি হবে?

শকুনি ॥ কেন?

খর্ব ॥ মানে আমরা দুজনে যদি ভাগাভাগি করি তা হলে এক জনের ভাগে ক'ভরি পড়বে—তাই হিসেব করছিলুম।

শকুনি ॥ আমার অঙ্গদ তোমরা ভাগাভাগি করবে কেন?

খর্ব ॥ আদেশ পালন করতে হবে না প্রভু! আমরা দুজনেই

সেই আদেশ পালন করব।

লম্বো ॥ আমার মধ্যমা কন্যার বিবাহের কথা হচ্ছে। কন্যা সুন্দরী নয়, রঙটাও ঈষৎ চাপা। মানে বিয়ের বাজারে যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা তাই। সুযোগ বুঝে পাত্রের পিতা ভরি আষ্টেক হেঁকে বসেছে। তাই শুধোচ্ছিলুম অঙ্গদদুটোয় যদি—

শকুনি ॥ ও সেই হত্যার ব্যাপার। না তার প্রয়োজন নেই।

লম্বো ॥ এ্যাঃ! প্রভু কি মত বদল করলেন?

শকুনি ॥ তোমরাই তো বলছিলে খেলাটা শেষ করে যেতে।

লম্বো ॥ আমি তো বলি নি প্রভু—ওই বেয়াই বলেছিল।

খর্ব ॥ আমি কি সত্যি সত্যি বলেছি নাকি? ও তো কথার কথা।

শকুনি ॥ ঠিক আছে—যদি ভবিষ্যতে কোনো দিন প্রয়োজন হয় তোমাদের ডাকব। এখন আমার পোশাকের পেটিকা থেকে দুটো পোশাক আনো—রাজ সভায় যেতে হবে।

[প্রহরীদের প্রস্থান]

মূর্তি ॥ সামনে এসে মাথা পেতে দাঁড়াও—আমি তোমকে বর দেব!

শকুনি ॥ কী বর পিতা?

মূর্তি ॥ আমার বরে তুমি অমর হবে।

শকুনি ॥ অমর! হা-হা-হা- ইচ্ছামৃত্যু নয়—একেবারে অমর।

মূর্তি ॥ হ্যাঁ! তার সঙ্গে দিচ্ছি দিব্য দৃষ্টি। একবার

সম্মুখ পানে তাকাও তো, কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

শকুনি ॥ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, তবে ছায়া ছায়া। ক্রমে ছায়ারা স্পষ্ট হচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে—

ছায়া ॥ বলো এখন কী দেখতে পাচ্ছ ?

শকুনি ॥ দেখছি অনাগত দিন ! তখনও আমি আছি। নতুন যুগের রাজসভায় বসে পাশা খেলছি। আমার রূপ বদল হচ্ছে, রঙ বদল হচ্ছে, আমি যেন এক নতুন শকুনি। তখনও আমি খেলছি ভাঙাগড়ার খেলা ঠিক আজকের মতো। তৈরি করছি ইতিহাস। কেবল অন্যের জন্যে, অন্য মানুষকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে—আমি তখনও পাশা খেলছি ! (অর্তনাদ করে) পিতা এ আশীর্বাদ না অভিশাপ !

মূর্তি ॥ দুখ কোরোনা। তুমি না অমর ! অমর হলে দুঃখ করতে নেই !

(পিতার মূর্তির কাছে বসে) পিতা ! ফিরিয়ে নাও তোমার আশীর্বাদ। আমি বর চাই না। অমরত্ব চাই না। আমি কেবল স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই। নিজের মতো করে বাঁচতে চাই, পিতা আত্মবিক্রয়ের লাঞ্ছনা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। দয়া করো— পিতা দয়া করো—

[শকুনির এই আর্তির মধ্যেই ধীরে ধীরে যবনিকা পড়বে]

—: ০ : —

তিনরঙ্গ

তিনরঙ্গ

পাত্র পাত্রী :

পরিচালক—রমাপ্রসাদ
নাট্যকার—প্রসাদ
অনুরাধা
শ্যামল
মঞ্জুশ্রী
বকুলদি
রাধারমণ
কিশোর - চা ওয়ালা

তিনরঙ্গ

[কোনো নাট্য সংস্থার রিহার্সাল ঘর। একটি সতরঞ্চ ও কয়েকটি হালকা চেয়ার, ছোটো টেবিল ও ফোন, সময় সন্ধে প্রায় ছটা। পরিচালক—নাট্যকার এবং অন্য-সভ্যারা আলোচনা করছে।]

পরিচালক ॥ এ ভাবে গ্রুপ চালানো যায় না। ইচ্ছে মতো আসব-যাব, কিছু বললেই গ্রুপ ছেড়ে নতুন দল করব !

নাট্যকার ॥ তাই নাট্য আন্দোলনের কিছু হল না !

শ্যামল ॥ হল না মানে, ব্যাঙের ছাতার মতো এ পাড়ায় ওপাড়ায় কত গ্রুপ গজালো। "আমি একটা নতুন গ্রুপ করেচি"—বলতে বেশ লাগে !

অনুরাধা ॥ কেমন লাগে ?

শ্যামল ॥ থ্রিলিং !

মঞ্জু ॥ রাধুদার কথা জানি না, তবে বকুলদির ব্যাপারটা

সম্পূর্ণ আলাদা ! পরশুই তো ওর বোনপোর বিয়ে গেল ।

অনু ॥ বোনপোর নয় মঞ্জুদি, বোনঝির !

মঞ্জু ॥ ওই হল ।

পরিচালক ॥ বোনপোই হোক আর বোনঝিই হোক নাটক is নাটক । আমাদের মালিনীর চেয়েও জেলাস মিসট্রেস !

নাট্যকার ॥ বলিস কী রমা, তোর বউ জেলাস ? পড়িস নি তো শোভেনদার বউ-এর পাল্লায় তাহলে বুঝতিস, জেলাস মিসট্রেস কাকে বলে । সেদিন কলামন্দিরে দেখা, খুব দুঃখ করছিল ! বললে আর বোধ হয় নাটক করা হল না !

মঞ্জু ॥ কেন ?

নাট্যকার ॥ গ্রুপ ডে-তে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তো রাত এগারোটা বারোটা বেজে যায় ।

মঞ্জু ॥ খুব স্বাভাবিক, আমি তো কোনো দিনই বারোটার আগে বাড়ি ঢুকতে পারি না ।

নাট্যকার ॥ তোমার কাছে স্বাভাবিক, কিন্তু জান কি শোভেনদা কতদিন রাত্রে বাড়ি ঢুকতে পায় নি ?

মঞ্জু ॥ ওমা কী ঘুমরে বাবা ! স্বামী বাইরে পড়ে রইল— বিমান তো আমার জন্যে—রাস্তায় এসে—

নাট্যকার ॥ ঘুম নয় ম্যাডাম কপট নিদ্রা । (পরিচালকের উদ্দেশ্যে) নাটক যদি জেলাস মিসট্রেস হয় তা হলে

সে তোর বউ নয় রমা—শোভেনদার বউ—oh ! father !

অনু ॥ বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে এই হয়। আজ দেবযানীকে বিয়ে করলে দুজনেই চুটিয়ে নাটক করতে পারত। বেচারাকে পাঁচ বছর ঝুলিয়ে রেখে শেষে—

শ্যামল ॥ এই জন্যেই বাবা আমি ওপথে নেই, শত হস্তেন—

মঞ্জু ॥ তা হলে মধুছন্দার কী হবে ?

শ্যামল ॥ কী হবে মানে ?

মঞ্জু ॥ বিয়ে করবি না সে কথা বলেছিস ?

শ্যামল ॥ হাজার বার।

মঞ্জু ॥ শুনে reaction ?

শ্যামল ॥ Nothing, বলে তোমাকে বিয়ে করতে হবে না, আমিই তোমাকে বিয়ে করব।

[নাট্যকার, মঞ্জু ও অনুরাধা হাসে]

পরিচালক ॥ ঠাট্টা নয়, সত্যি চিন্তার কথা। কোথায় গেল সেই সব নাট্যকর্মী। শোভেনদার মুখে শুনেচি ওদের গ্রুপের কে যেন একবার শোয়ের দশমিনিট আগে গ্রিনরুমে এসেছিল। শোভেনদার মেজাজ তো জানই, সেদিন মেকাপ নিতে বসিয়ে ছেলেটাকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছেড়েছে। দেরিতে আসার কারণ জানা

গেল নাটকের পর। মাথায় পিঠে হাতবুলিয়ে একটু ইয়ে করতেই কেঁদে ফেলল। বললে—'আজ বাবাকে দাহ করে এলাম শোভেনদা! একমাত্র ছেলে তো গঙ্গায় গিয়ে নাভিকুণ্ড ভাসিয়ে আসতেই দেরি হয়ে গেল! 'ভাবলে চোখে জল এসে যায়।

নাট্যকার ॥ হ্যাঁ বিমল নাগ। আমিও শুনেচি। শোভেনদা প্রায়েই এ গল্প করে। অথচ ক'জন বিমল নাগের নাম জানে বল?

রমাপ্রসাদ ॥ আর সেদিন কলামন্দিরে আমাদের গ্রুপের এক জন এলেন শো আরম্ভ হবার আধঘণ্টা পরে, যুক্তি কী, না last সিনে তো কেবল দুটো কথা।

[কথাগুলি শ্যামলকে উদ্দেশ্য করে বলা।
শ্যামল সেটা বোঝে]

নাট্যকার ॥ কার কথা বলছিস?

শ্যামল ॥ রমাদা এমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্চে সবাই ভাববে বুঝি আমি।

[মঞ্জু হঠাৎ দূরে কিছু দেখে বলবে]

মঞ্জু ॥ ওই বকুলদি আসছে।

[বকুল কী-কী বলবে সবাই জানে, তাই শ্যামল বকুল
ঢোকার আগেই বলে]

শ্যামল ॥ Sorry-very sorry! বড্ড দেরি হয়ে গেল, কী করব ভাই সেই জ্যাম। তারাতলা পেরিয়ে ব্যাস! ঠায় আধঘণ্টা বাসে বসে আছি।

[বকুলদি ঘরে ঢুকেই যন্ত্রের মতো শ্যামলের এই কথাগুলিই বলবে]

বকুল ॥ Sorry, very sorry ! বড্ড দেরি হয়ে গেল, কী করব ভাই সেই জ্যাম ! তারাতলা পেরিয়েই ব্যাস ! ঠায় আধঘণ্টা বাসে বসে আছি ।

[সকলের হাসি]

বকুল ॥ হাসির কথা কী হল ?

মঞ্জু ॥ শ্যামলের সেই ফাজলামি বোসো বকুলদি ।

[রমাপ্রসাদ টেবিল থেকে নাটকের Script হাতে নেয়]

রমা ॥ সবাই তো এসে গেছে তাহলে শুরু করি ?

শ্যামল ॥ খালি রাধুদাই বাকি ।

[রাধারমনের কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ শোনা যায়]

রাধা ॥ এসে গেছি, এসে গেছি । (তার হাতে সিঙাড়ার ঠোঁঙা) সিঙাড়া ভাজিয়ে আনলুম তো তাই দেরি হল ।

নাট্যকার ॥ সিঙাড়ার দোহাই দিয়ে আজ খুব বেঁচে গেলি রাধু ।

রমা ॥ বেশ—সিঙাড়া খেতে খেতেই আরম্ভ করি । প্রসাদদার তিনরঙ্গের Script পড়া হয়েছে, আলোচনাও হয়েছে । আচ্ছা প্রসাদদা একটা কথা, সম্পূর্ণ অরিজিনাল তো ?

প্রসাদ ॥ বিলকুল আসলি, পানিসে ধোকর দিখা সকতা হুঁ !

রমা ॥ জিনিসটি কি হল দাদা ?

প্রসাদ ॥ নকল পাঞ্জাবীর সংলাপ । পাত্রীর দুধে-আলতা রঙ দেখে পাত্রপক্ষ প্রশ্ন করেছিল, এ রঙ আসল না

নকল ? পাত্রীপক্ষের উত্তর ছিল—"বিলকুল আসলি, পানিসে ধোকর দিখা সিকতা হুঁ !

রমা ॥ অর্থাৎ তোমার নাটক বিলকুল আসলি। জিগ্যেস করলুম বলে কিছু মনে কোরো না, একটু বিদেশী বিদেশী গন্ধ লাগল তাই—

মঞ্জু ॥ চুরিতে দোষ নেই রমাদা, ধরা না পড়লেই হল ! এখনকার ninety percent নাটকই বিদেশী অনুপ্রাণিত।

রমা ॥ ঠিক কথা, ভালো জিনিস চুরি করলে দোষ নেই, তবে স্বীকার করাই ভালো। ছায়া অবলম্বনে অনুপ্রাণিত এ জাতীয় একটা বিশেষণ জুড়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।

রাধা ॥ আচ্ছা প্রসাদদা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, আজকাল অনুদিত কথাটা কেউ ব্যবহার করে না।

প্রসাদ ॥ লক্ষ্য করেছি। আরও অনেক কিছুই লক্ষ্য করছি আমাদের বেলায় একটা করে, আর নায়িকাদের বেলায় দুটো-দুটো।

রাধা ॥ না না আপনাদের জন্যেও দুটো আছে।

প্রসাদ ॥ ছাড়ো।

[রাধা প্রসাদকে আরও একটা সিঙাড়া দেবে]

রমা ॥ নাটকে চরিত্র মোট দুটি। প্রকাশ আর রত্না। এরাই মেকাপ পাল্টে পাল্টে অভিনয় করবে। আচ্ছা

প্রসাদদা ভাবছি দুটো চরিত্রকে ছটা করলে কেমন হয়? তিনটে প্রকাশ, তিনটে রত্না। এতে সময় বাঁচবে আর অনেকে কাজও পাবে।

বকুল ॥ হ্যাঁ, বসে বসে হাঁটুতে বাত ধরে গেল। শেষ কাজ করেছি বাদল সরকারের বড়ো পিসিমায়। আজকাল আমাদের মতো বয়স হলেই গ্রুপে অচল।

প্রসাদ ॥ এ কথা কেন বলছেন?

বকুল ॥ আমাদের মতো বুড়োবুড়ি আপনাদের নাটকে আসছে কই? আপনাদের যত চিন্তা আর এক্সপেরিমেন্ট সব Young-দের নিয়ে।

প্রসাদ ॥ আচ্ছা পরে এক দিন এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। (রমাকে উদ্দেশ্য করে) তাহলে, তুই বলছিস দুটো চরিত্রকে ছটা বানাবি?

রমা ॥ না, চরিত্র দুটোই থাকবে, অভিনয় করবে ছ'জনে।

অনু ॥ তা হলে দাঁড়াচ্ছেটা কী, ছটি চরিত্রের সন্ধানে নাট্যকার!

শ্যামল ॥ দারুণ বলেছিস, দেখো প্রসাদদা তোমার তিনরঙ্গের চেয়ে এ নামটা কিন্তু appropriate।

প্রসাদ ॥ তুই থাম! লোকে বলবে রুদ্রপ্রসাদের নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র থেকে মেরে দিয়েছি। আমি বাবা ওর মন্দে নেই।

রমা ॥ ঠিক। নাম নিয়ে আমিও ভাবছি না, কিন্তু একটা

জিনিস ভাবছি—আচ্ছা প্রসাদদা নাটকে তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় রত্না আর প্রকাশকে দেখানো হয়েছে —এই তো ?

প্রসাদ ॥ হ্যাঁ, রত্না প্রেমিকা-স্ত্রী-মা। তেমনি প্রকাশও প্রেমিক স্বামী—ছেলে। কিন্তু কোনও চরিত্রই কোনও চরিত্রের পরিণতি নয়। সবাই আলাদা আলাদা মানুষ।

শ্যামল ॥ নামগুলো আলাদা আলাদা করে দিন না প্রসাদদা, দর্শকের গোলমাল হয়ে যাবে না ?

বকুল ॥ একটু ঘোরপ্যাঁচ না থাকলে আধুনিক নাটক হয় না ভাই। দেখতে দেখতে অডিটোরিয়াম থেকে আওয়াজ দেবে, 'একটা মানে বই দেবেন'—তবেই না আধুনিক নাটক।

প্রসাদ ॥ এখানে জটিলতা কোথা ? রত্না মানে একটি বিশেষ নারী, সে প্রেমিকা, স্ত্রী, আবার মা একই সময়। ধরো —আজ তারিখ কতো ?

[শ্যামলের উদ্দেশ্যে, শ্যামল এক বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে]

শ্যামল ॥ Tenth !

প্রসাদ ॥ 10th of April, 1900—এই বিশেষ দিনে রত্না বলে মেয়েটা কোথাও প্রেমিকা, কোথাও স্ত্রী, আবার কোথাও মা।

রমা ॥ দুদিন তোমার নাটক পড়া আর আলোচনা হয়েছে। আমি যতটা বুঝেছি, তোমার রত্না হল একটি বিশেষ নারী সত্তার প্রতীক ! আর তোমার অভিপ্রেত পুরুষ

প্রতিনিধি হল প্রকাশ। কালিদাসের যক্ষ আর যক্ষ-বধূ।

অনু ॥ ওরে বাবা! ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে যাচ্ছে। প্রসাদদা আপনি আর একটু সহজ করে নাটক লিখতে পারেন না?

প্রসাদ ॥ কঠিন? কোনখানটা? নাটক পড়া হল, আলোচনা শুনলে, বোঝনি?

অনু ॥ নাটকটা বুঝেছি, কিন্তু যখন আলোচনা করে বোঝাচ্ছেন তখন—মানে শুনতে সোজা, বুঝতে কঠিন।

প্রসাদ ॥ তোমার আমার শরীরের মধ্যেও একটা কঠিন পদার্থ আছে কিন্তু সেটা না হলে চলে?

রাধারমণ ॥ বেশ ব্যাপারটা না হয় এক রকম করে বোঝা গেল। আর না বুঝলেও—(কাশি) তুমি বুঝিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু তোমার character-এর নামগুলো বড়ো সেকেলে! 'প্রকাশ'—আজকাল এ নাম কেউ রাখে? 'রত্না'—রত্না তো আমার জ্যেঠিমার নাম।

প্রসাদ ॥ বেশ আধুনিক করতে চাও একটা করে সু জুড়ে দাও। সু-প্রকাশ, সু-রত্না।

রমা ॥ এসো এখন তা হলে আরম্ভ করা যাক। রাধু তুমি এখন থেকে সেট আর light এর কথা ভাবো।

রাধা ॥ সেট আমার রেডি, দেখাচ্ছি।

[রাধারমণ একটা আর্ট পেপারে আঁকা স্টেজ ক্লাপট এর ডিজাইন মেলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের মাঝখানের পর্দা সরে যায়। কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে রমা বলে]

রমা ॥ বাঃ ফাইন! এসো তা হলে আরম্ভ করা যাক।

[রাধু চেয়ার ইত্যাদি সরিয়ে সেট সাজায়]

শ্যামল ॥ চা পর্বটা চুকিয়ে নিলে হত না? সিঙাড়ার পর থেকেই প্রাণটা চা চা করছে।

রমা ॥ না-এমনিতেই আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রথম-রঙ্গের শেষে টি-ব্রেক। রাধু যাও শিবুদার দোকানে চা বলে এসো। তুই আয় (শ্যামলকে উদ্দেশ্য করে) প্রকাশটা বল, প্রথমরঙ্গের প্রকাশ, অনু এসো প্রথম-রঙ্গের রত্না। প্রসাদদা Script ধরো।

প্রসাদ ॥ আমি প্রম্প্‌ট্‌ করব?

রমা ॥ রাধু এলে তাকে ধরিয়ে দিয়ো। Next week থেকে আর প্রম্প্‌ট্‌ চলবে না।

[Script পড়ে]

পর্দা খোলার পর টেলিফোন বাজবে। শ্যামল মুখে ফোনের আওয়াজ করিস। ওটাই অনুর কিউ।

[রমা হাতের Script প্রসাদকে ধরিয়ে দেয়। প্রসাদ বাইরে চলে যায়]

শ্যামল ॥ আজকাল কি টেলিফোন আওয়াজ করে?

[দু এক জনের হাসি।]

রমা ॥ বি-সিরিয়াস।

[শ্যামল বাইরে যায়। মঞ্জু, বকুল ঘরের এক দিকে সরে গিয়ে বসে। বকুল ব্যাগ থেকে পান বের করে, লুব্ধ দৃষ্টিতে মঞ্জু সেদিকে তাকিয়ে থাকে, পরিচালক অনুকে নিচু গলায় কিছু নির্দেশ দেয়, অনু একটা বই হাতে নিয়ে সারা ঘরে পায়চারি করে এবং কিছু শোনার জন্যে এ দিক ও দিক তাকায়]

রমা ॥ শ্যামল ফোনের Sound কই ?

[নেপথ্যে ঃ শ্যামল মুখে ফোনের sound করে। অনু ফোন ধরে কিন্তু অনুর কণ্ঠস্বরের বদলে শোনা যায় প্রসাদবাবুর কণ্ঠস্বর]

প্রসাদ ॥ হ্যালো, শুভ্রা রায় ? কতো নম্বর চান ? সরি রং নাম্বার।

রমা ॥ Stop, এটা কী হল প্রসাদদা ?

প্রসাদ ॥ (ভেতরে এসে) ইয়ে খুব জোরে হয়ে গেল তাই না ? আচ্ছা Volume-টা একটু কমিয়ে দিচ্ছি।

[প্রসাদ বাইরে যায়। শ্যামল মুখে ফোনের আওয়াজ করে, অনুরাধা দ্রুত ফোন ধরতে যায় কিন্তু সত্যিকারের ফোনটা বেজে ওঠে। অনু চমকে ফোন ধরে।]

অনু ॥ হ্যালো ! মধুমিতা....হ্যাঁ শ্যামল আছে, দিচ্ছি ধরো !

[অপ্রস্তুত শ্যামল মঞ্চে এসে ফোন ধরে]

রমা ॥ (একটা চেয়ারে বসে পড়ে) Hopeless !

শ্যামল ॥ কথা বলছি....তুমি আর সময় পেলে না ? হ্যাঁ রিহার্স হচ্ছে....জানি না, এই মাত্র শুরু হল ! দেখতে আসছে ? ....ও তা দেখা দাও না ...আমি কী বলব রাখছি... না আজ পারব না। কাল ? জানিনা রিহার্সাল থাকলে পারব না .. বলছি রিহার্সাল থাকলে পারব না !

[রেগে। দুম করে ফোন রেখে শ্যামল বাইরে চলে যায়। রাধা কেবল মাথাটা বাড়িয়ে বলে]

রাধা ॥ Script ধরছি।

[শ্যামল আগের মতোই মুখে ফোনের sound করে]

অনু ॥ হ্যালো, শুভ্রা রায় ? কতো নাম্বার চান....সরি রং নাম্বার।

[সহসা চায়ের কেটলি ও কিছু মাটির ভাঁড় হাতে নিয়ে এক কিশোর অডিটোরিয়ামের ভেতর দিয়ে মঞ্চে এসে ঢোকে। মুখে বাজার চলতি হিন্দী গান]

কিশোর ॥ যা যা যা কবুতর যা—

রমা ॥ (উত্তেজিত) hopeless। রাধু-রাধু কখন চা আনতে বলেছ ?

রাধা ॥ আমি তো কেবল চা বলে এসেছি, কখন দিতে হবে বলি নি।

রমা ॥ (কিশোরের উদ্দেশ্যে) চা নিয়ে যা, এখন রিহার্সাল চলবে।

কিশোর ॥ যা বাবা, শিবুদা যে বলল, ভুচু কেলাপে চা লিয়ে যা।

বকুল ॥ চা যখন এসেই গেছে তখন আর ঠাণ্ডা করে লাভ কী! টি-ব্রেকের পরেই শুরু করুন।

[রমাকে উদ্দেশ্য করে]

রমা ॥ (ভুচকে উদ্দেশ্য করে) দে তাড়াতাড়ি দিয়ে কেটে পড়।

প্রসাদ ॥ মাঝখান থেকে মধুমিতা বেচারা বকা খেয়ে মরল?

[ভুচু সবাইকে ভাঁড়ে চা দেয়। হাতে চায়ের ভাঁড় নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে রমাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ায়। ভুচু গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে থাকে]

ভুচু ॥ কভি কভি অ্যসা হোতো ক্যায়া হ্যা। হাম তুম এক কামরেমে—

রমা ॥ মারব এক চড়, ফাজিল ছেলে কোথাকার—

ভুচু ॥ যা বাবা, আমি কী করলুম?

রমা ॥ ভাগ এখান থেকে—যা

ভুচু ॥ যা-যা-কবুতর যা—

[গাইতে গাইতে সম্ভব হলে অডিটোরিয়ামের মাঝখান দিয়ে প্রস্থান]

রমা ॥ এই অবস্থায় আমাদের নাটক করতে হয়। তারপর মনের মতো না হলেই 'কিস্যু হল না! (রাধারমণের উদ্দেশ্যে) নাত পর্দাটা একটু টানো।

[ধীরে ধীরে পর্দা নামে। খানিক বাদে পর্দা উঠলে প্রথম-

[রঙ্গ শুরু হবে। পূর্বের সেট ইত্যাদি। কেবল ঘরের মধ্যে কেউ নেই, অভিনীত চরিত্র ছাড়া। অনু একটা বই হাতে নিয়ে পায়চারি করছে। সহসা ফোন বাজে। অনুর নাম এখন রত্না]

রত্না ॥ হ্যালো! শুভ্রা রায়?.... কত নাম্বার চান?....স্যরি রং নাম্বার। আমার নাম? শুনে কী হবে? কী.... ননসেন্স! (ফোনটা রেখে) এদের পুলিশে দেওয়া উচিত!

[প্রকাশের অর্থাৎ শ্যামলের প্রবেশ]

প্রকাশ ॥ কাকে পুলিশে দেবে?

রত্না ॥ তোমাকে!

প্রকাশ ॥ আমার অপরাধ?

রত্না ॥ চুরি-ডাকাতি এবং অনধিকার প্রবেশ!

প্রকাশ ॥ এক সঙ্গে অনেকগুলো অভিযোগ! প্রমাণ করতে পারবে?

রত্না ॥ প্রমাণ—অ-প্রমাণের প্রশ্ন আদালতে। আপাতত হাজত-বাস করো। Case উঠলে প্রমাণ দাখিল করব।

প্রকাশ ॥ ব্যারিস্টার কন্যার উপযুক্ত সংলাপ। হাজত বাস করতে রাজি আছি, চা হবে?

রত্না ॥ অবশ্যই, সঙ্গে ফিস-বোল।

প্রকাশ ॥ কী ব্যাপার বলবে তো, আজ খুব খাতির দেখছি।

জামাই না হতেই জামাই-আদর !

রত্না ॥ জামাই-আদরের কী দেখলে ?

প্রকাশ ॥ দরজা খুলেই ভোলার মার এক মুখ হাসি, তারপর চায়ের সঙ্গে ফিস-রোল—

রত্না ॥ ভোলার মায় মুখটাই অমন-হাসি-হাসি, আর ফিস-রোল দিদির বাড়ির জন্যে তৈরি হয়েছে—মানে তৈরি করে ওরা দিদির বাড়ি নিয়ে গেছে—

প্রকাশ ॥ তার মানে বাড়িতে কেউ নেই ?

রত্না ॥ কেন থাকবে না, ভোলার মা আছে, আমি আছি—

প্রকাশ ॥ তোমার মা বাবার কথা বলছি, আমার হবু শ্বশুর শাশুড়ী ?

রত্না ॥ ফাজিল, আমি বুঝি কেউ এর মধ্যে পড়ি না ?

প্রকাশ ॥ অবশ্যই। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রাহ্য করি না !

রত্না ॥ কাকে গ্রাহ্য কর শুনি ?

প্রকাশ ॥ তোমার মাকে, কিছুটা বাবাকে আর—

রত্না ॥ আর ?

প্রকাশ ॥ তোমাদের কুকুরটাকে।

রত্না ॥ একবার ডাকব নাকি ? ও পাশের ঘরে আছে-ভুটান—

[পাশের ঘরে কুকুরের ডাক শোনা যায়]

প্রকাশ ॥ এই—এই রক্ষে কর,—ভুটানকে ডেকো না ও আমাকে মোটেই respect করে না।

রত্না ॥ respect ? বলো দেখতে পারে না।

প্রকাশ ॥ ওই হল, এত দিন দেখছ তবু সন্দেহ গেল না।

রত্না ॥ বাবার খুব বিশ্বাসী তো—duty করে। বোসো চা আনছি।

[রত্না রাইরে যাবার খানিক পরেই ফোন বাজে। প্রকাশ ফোনটা ধরে।]

প্রকাশ ॥ হ্যালো !....হ্যা আছেন....আমি কেউ না, এই বাড়িতে কাজ করি, ধরুন দিদিমণিকে ডাকছি।

[রত্না ছুটে এসে প্রকাশের হাত থেকে ফোন নেয়]

রত্না ॥ হ্যালো ! হ্যাঁ বলুন রত্না বলছি....বাড়িতে কেউ নেই, সবাই দিদির ওখানে গেছে। ....আলাপ ? আমি কী বলব এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গেই কথা বলুন। সন্দের পর পাবেন....দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে.... কখন ? (ফোন রেখে) যা কেটে গেল !

প্রকাশ ॥ কী ব্যাপার, পুলিশ মনে হচ্ছে ?

রত্না ॥ হ্যাঁ ইটি দিদি জুটিয়েছে, ডাঃ পুরন্দর ব্যানার্জী, F. R. C. S.

[প্রকাশ সহসা গম্ভীর। সিগারেট ধরায়]

রত্না ॥ কী হল, হঠাৎ গম্ভীর ?

প্রকাশ ॥ গম্ভীর হওয়া ছাড়া এখন আমার করণীয় কী ? দাঁত বের করে হাসব ?

রত্না ॥ না কাঁদবে। এই-এই ঘরে ছাই ফেলো না, ভোলার মা এই মাত্র মুছে গেছে।

[রত্না একটা ছাইদানী এগিয়ে দেয়]

রত্না ॥ তুমি আবার মরতে ফোন ধরতে গেলে কেন ? 'কেউ না, এ বাড়িতে কাজ করি।'

প্রকাশ ॥ কানের কাছে কিরিং কিরিং করলে কী করব, হাতটা হঠাৎ চলে গেছে। তা তোমার জন্যে দিদির এত মাথা ব্যথা ?

রত্না ॥ দাঁড়াও আগে চা টা নিয়ে আসি, ভিজিয়ে এসেছি।

[প্রকাশ টেবিলে রাখা একটা ট্রানজিসটার খোলে, একটা আনন্দের হিন্দীগান শোনা যায়। বিরক্ত হয়ে প্রকাশ বন্ধ করে, চা এবং প্লেটে ফিসরোল নিয়ে ঘরে ঢোকে রত্না, প্রকাশ চায়ের দিকে হাত বাড়ায়]

রত্না ॥ আগে তো রোলটা খাবে !

প্রকাশ ॥ না আগে চা খাব।

রত্না ॥ খিদে পেয়েছে বললে না ?

প্রকাশ ॥ খিদে চলে গেছে।

রত্না ॥ একটা ফোনের ধাক্কায় কুপোকাত্।

প্রকাশ ॥ (চায়ে চুমুক দিয়ে) এখন বলো কত দূর গড়িয়েছে ?

রত্না ॥ খানিকটা। দেখে গেছে। বিলেত ফেরত F. R. C. S.।

প্রকাশ ॥ ওরে বাবা ঃ এখন ?

রত্না ॥ এখন আমার সঙ্গে এক দিন আলাদাভাবে আলাপ করতে চায়।

প্রকাশ ॥ নিভৃতে ? বিয়ের আগে কিঞ্চিৎ প্রেমের স্বাদ গ্রহণ !

রত্না ॥ এই বড্ড ভাট্ বকছো।

প্রকাশ ॥ যা সত্যি তাই বলছি, এটাই ফ্যাশন।

রত্না ॥ কোন্‌টা ?

প্রকাশ ॥ পছন্দ হলে নিভৃতে আলাপ। প্রথম দু'চার মিনিট আপনি-আপনি, তার পর দুম করে তুমি।

[এর পর প্রকাশ অভিনয় কোরে কোরে বলে]

আচ্ছা তোমার কী ভালো লাগে, সিনেমা না নাটক ? নাটক ! আমারও। বই পড়তে ভালো লাগে ? লাগে ! **fine** ! তোমার ফেবারিট অথার কে ? সুনীল গাঙ্গুলী ! টপ্‌—আমারও সুনীল গাঙ্গুলী। আর কবিতা ? বোঝ না ! কিন্তু পড়তো ? ভালো লাগে ? লাগে ! গুড, আমারও, যদিও বুঝি না তবু পড়ি।

রত্না ॥ খুব ভালো হচ্ছে। কিন্তু এটা এখানেই শেষ করো, আর ভালো লাগছে না। রোলটা খাবে না ?

প্রকাশ ॥ খাব খাব, কী ভাবছো দেবদাস হয়ে গেছি ! চাই কি তোমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করলে এক পেট খেয়ে যেতেও পারি।

[রোল খেতে খেতে]

কেমন দেখতে ডাঃ পুরন্দর ব্যানার্জী **F. R. C. S.** ?

রত্না ॥ জানি না।

প্রকাশ ॥ এরপর নিশ্চই তোমার লেখা চিঠিগুলো ফেরত চাইবে ?

রত্না ॥ অবশ্যই চাইব।

প্রকাশ ॥ যদি না দেই ?

রত্না ॥ দিও না, বাঁধিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রেখো।

প্রকাশ ॥ পরে যদি ব্লাক্‌মেল করি ?

রত্না ॥ রুচিতে না বাঁধলে কোরো।

প্রকাশ ॥ তুমি ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ না !

রত্না ॥ তুমি দিচ্ছ ?

প্রকাশ ॥ আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না ?

রত্না ॥ ছাই ! আমি বলে ভেবে মরে যাচ্ছি, আর উনি 'ক' শুনেই কেষ্ট বুঝে ফেলেছেন ! প্লেটটা দাও ওতে আর কিছু নেই।

[প্লেট সরিয়ে রাখে]

প্রকাশ ॥ এখন কী করবে ভেবেছো ?

রত্না ॥ আমি ভাবব না তুমি !

প্রকাশ ॥ আমি ?

রত্না ॥ অবশ্যই এটাই তো নিয়ম।

[প্রকাশ সিগারেট ধরায়]

প্রকাশ ॥ আচ্ছা আব কিছুদিন ওয়েট করা যায় না ?

রত্না ॥ অন্য লাইনে ভাব, ও স্টেজ পার হয়ে গেছে। বুঝতে পারছ না Final কথা বলতে ওরা দিদির বাড়ি গেছে। (খানিক বাদে) তোমার ব্যাঙ্কের ওটার কী হল ?

প্রকাশ ॥ চান্স কম।

রত্না ॥ ভারত মেটাল ?

প্রকাশ ॥ ফিপটি ফিপটি, ফিপটি হোপ, ফিপটি নো হোপ!

রত্না ॥ হোপের দিকটা একটু ইয়ে করা যায় না ?

প্রকাশ ॥ যায়, শুনেছি ওদের পারচেজিং অফিসারের একটি মোটা কালো মেয়ে আছেন, তাকে পাল্লায় বসালেই হয়ে যায়।

রত্না ॥ Hopeless! অন্য লাইনে ভাব (হঠাৎ বিরক্ত হয়ে) যত ঝামেলা পাকাতে পার।

প্রকাশ ॥ আমি, কী ঝামেলা পাকালাম ?

রত্না ॥ একে অ-ব্রাহ্মণ তায় বয়েসে ছোটো।

প্রকাশ ॥ তুমি আমার চেয়ে বড়ো ? মেলা ঢপ্ দিয়ো না।

রত্না ॥ Fact! তোমার তো Sixty five-এ, আমার Sixty four-এ জন্ম। অবিশ্যি মেয়েদের বয়স একটু বেশি থাকাই ভালো। এমনিতেই ছেলেরা মানতে চায় না, তার ওপর ছোটো হলে তো কথাই নেই—এটা আমার থিয়োরি।

প্রকাশ ॥ তোমার ডাঃ পুরন্দর ব্যানার্জী F. R. C. S. বয়সে ছোটো ?

রত্না ॥ না বড়ো, প্রায় দশ বছরের।

প্রকাশ ॥ তা হলে ?

রত্না ॥ তা হলে কি ? আমি কি ওকে বিয়ে করব নাকি ? জান তোমার কথা একদিন দিদিকে বলেছিলাম, দিদি বলেছে জামাইবাবুকে।

প্রকাশ ॥ Result ?

রত্না ॥ জিরো ! জামাইবাবুর আপত্তির কারণ কাস্ট আর দিদির আপত্তি বয়েস। আমার দিদির চেয়ে জামাইবাবু বারো বছরের বড়ো।

[ফোন বাজবে। রত্না প্রকাশকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে ফোন তুলবে।]

রত্না ॥ হ্যালো ! দিদি বল....রাত হবে....আচ্ছা ঠিক আছে....কী আর করব, পড়ছি। (প্রকাশ কেশে ওঠে) না কেউ নেই তো....কাশি ? আ-তু-তু ভুটান ! হ্যাঁ ও তো মানুষের মতোই কাশে-কাঁদে হাসে। হাসে মানে হাসি হাসি ভাব করে। আচ্ছা....রাখি ? (ফোন রাখে) তুমি একটা ইয়ে কাশতে গেলে কেন ?

প্রকাশ ॥ Mere accident, তাই বলে তুমি আমাকে ভুটান বানাবে ?

রত্না ॥ ম্যানেজ করতে হবে তো। যাক্ ওদের ফিরতে রাত হবে, এখন ভেবে চিন্তে একটা Plan ঠিক করো।

প্রকাশ ॥ (ভাবতে ভাবতে) Plan Plan ! আচ্ছা তোমার পরীক্ষা অবদি ব্যাপারটা ঠেকিয়ে রাখা যায় না ?

রত্না ॥ যায়, কিন্তু পরীক্ষার পর কী হবে ? ল্যাজ গজাবে ?

প্রকাশ ॥ না ল্যাজ খসবে, তোমার একটা চাকরিবাকরি হয়ে যেতে, পারে।

রত্না ॥ বাংলা M. A. পাশ করে চাকরি, খেপেছ ! (কিছু

ভেবে) এই চুমচুমকে একটা ফোন করব ?

প্রকাশ ॥ এর মধ্যে আবার চুমচুমকে জড়াচ্ছ কেন ?

রত্না ॥ ওদের কেসটাও যে আমাদের মতো। ইণ্টারকাস্ট, তার ওপর বেকার। বিয়ের পর দুজনে চুটিয়ে টিউশন করে সংসার চালাত।

প্রকাশ ॥ ফাইন, বাংলা সিনেমা !

রত্না ॥ সিনেমা নয় মশাই—Life ! a real life, a love ! ওর বর তীর্থ এখন একটা কোম্পানীর সেক্রেটারি। ফোন, গাড়ি, বাড়ি, বাড়ি মানে Flat।

প্রকাশ ॥ হিন্দী সিনেমা !

রত্না ॥ তোমার মুণ্ডু। দাঁড়াও এক বার ট্রাই করি।

[ফোনের চেষ্টা করে এবং লাইন পায়।]

হ্যালো ! চুমচুম ? আমি রত্না বলছি....তোর কী খবর বল ?....আমাদের কোন news নেই ! পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি, ওদিকে আমাকে ঝোলাবার চেষ্টা হচ্ছে।....কার কাছে শুনলি ?....দিদির সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে ?....আচ্ছা আচ্ছা। শোন তোকে একটা উপকার করতে হবে। তার আগে বলতো তীর্থর অফিসে লোক নেবে ? ধ্যাত্‌ বাড়ির কাজের লোকের কথা বলছি নাকি, বলছি তোর বরের অফিসে নিউ রিক্রুট হবে ?....আচ্ছা আচ্ছা, হলে প্রকাশের কথা বলবি। আর একটা ব্যাপারে তোর হেল্প চাই, আমরা রেজিস্ট্রি করব, তোকে ব্যবস্থা করে দিতে

হবে। ....তুই আমাদের আদর্শ, গ্যাস? as you think! ....নতুন খবর? তাই বল কত দিন? কনগ্রাচুলেশন ...কাল বাড়ি আছিস? এই ধর বিকেল চারটে-পাঁচটা.... আচ্ছা, কাল বিকেলেই কথা হবে ....বাই।

[ফোন রাখে]

রত্না ॥ এই চুমচুম শিগগির মা হচ্ছে।

প্রকাশ ॥ আর কতদিন রোমিও জুলিয়েট হয়ে ঘুরবে, পাঁচ বছর তো বিয়ে হল। আমরা দু বছরের—মধ্যেই—

রত্না ॥ ধ্যাত্! আগে তোমাকে Settle হতে হবে ভালো চাকরি গাড়ি ফ্লাট। তীর্থর কী ছিল বল, ওই তো চেহারা, প্লেন গ্রাজুয়েট। আজ কেমন দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রকাশ ॥ শোনো, তুমি ডাঃ পুরন্দর ব্যানার্জীকেই বিয়ে করো। সেটেলমেণ্ট, সিকিয়োরিটি, গাড়ি-বাড়ি-ফোন---

রত্না ॥ ওঃ রাগ হয়ে গেল। বেশ তোমার কাছে কিছুই চাই না যা খাওয়াবে তাই খাব, যা পরাবে তাই পরব---সেই যে কী আছে-- যদিদং হৃদয়ং তব,
তদিদং হৃদয়ং মম।

[সহসা ফোন বাজবে। ইঙ্গিতে প্রকাশকে চুপ করতে বলে রত্না ফোন ধরে]

হ্যালো! বলছি....বুঝেছি। বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন....কাল বিকেলে? না কালকের দিনটা বাদ

দিন আমার একটু ইয়ে... বাবা বললেই হবে ? কাজ তো আমার....শুনুন একটা স্পষ্ট কথা বলি, আমি একজনকে ভালোবাসি, আমরা শিগ্‌গির রেজিস্ট্রি করব ! আমার কিছু করবার ছিল না,সবটাই এগিয়েছে দিদির জেদে, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আশা করি আর এগোবার চেষ্টা করবেন না। নমস্কার !

[ফোনটা নামিয়ে রাখে]

প্রকাশ ।। কী হল মাথা গরম করলে কেন ?

রত্না ।। বেশ করেছি।

প্রকাশ ।। এর মানে কিন্তু বিদ্রোহ !

রত্না ।। মানে যদি তাই হয় তো হোক বিদ্রোহ।

প্রকাশ ।। আরও কিছুদিন তৈরি হবার সময় নিলে পারতে। ডাঃ পুরন্দর ব্যানার্জী এখুনি তোমার দিদির বাড়িতে রিং করবেন, মা বাবা খবরটা জেনে যাবেন।

রত্না সো হোয়াট ! আমি কি কচি খুকি ! ভালো মন্দ বিচারের বয়স আমার হয়েছে।

প্রকাশ তোমার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারবে ?

রত্না কী বলব —'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' ! ব্যাপারটা খুব নাটকীয় হয়ে যাবে তাই—নইলে বলতাম। তা ছাড়া ফোনেই তো সব জেনে যাবে। (সহসা উত্তেজিত) একটা কথা শোন যদি সে রকম বুঝি আমি বাড়ি থেকে পালাব। ঠিক চুমচুমের মতো।

প্রকাশ ॥ সে কী! তারপর? থাকবে কোথায়? পাগলামি কোরো না রত্না!

রত্না ॥ জানো রেজিস্ট্রির দিন চুমচুমকে বাড়িতে আটকে রেখেছিল। কৌশলে ছাড়া পেয়ে ও বারান্দা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে। তার পর একটা রিক্সায় চেপে সোজা থানায়। সেখানে ফার্স্ট এড্ নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে। আমরা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, তীর্থটা সিগারেটের পর সিগারেট টানছে, এমন সময় চুমচুম হাজির, হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ, সঙ্গে একজন পুলিশ। বলে থানায় গিয়ে প্রোটেকশনের জন্যে পুলিশ নিলাম, যদি আবার পথের মধ্যে আটকায়—বোঝো!

প্রকাশ ॥ তুমিও চুমচুমের লাইনে ভাবছ নাকি?

রত্না ॥ একবার যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি, তখন ভেবে রাখতে দোষ কী! বাবাকে তো জানই, যা রাগী মানুষ! দিদির তো ওর প্রফেসরের সঙ্গে প্রেম ছিল। বাবা যে দিন জানতে পারে দিদি প্রফেসরকেই বিয়ে করবে, সে দিন মাকে ডেকে বললেন—'ওকে বলে দিয়ো তার আগেই আমি ওকে গুলি করে মারব।'

প্রকাশ ॥ গুলি করে, না-না ওঠা রাগের কথা। কেউ নিজের মেয়েকে গুলি করে মারতে পারে!

রত্না ॥ নিজের মেয়েকে নয় মশাই, পাত্রটিকে।

প্রকাশ ॥ না-না খুনোখুনি জিনিসটা মোটেই ভালো নয়। সে মেয়েই হোক আর পাত্রই হোক!

রত্না ॥ প্রকাশ তুমি কি ভয় পেয়ে গেলে?

প্রকাশ ॥ ভয়! কী যে বলো প্রকাশ দত্তকে তুমি মরার ভয় দেখাচ্ছ, তোমার জন্যে আমি এই রকম তুড়ি মেরে মরতে পারি।

রত্না ॥ ঠিক রক্তকরবীর কিশোরের মতো বলেছ। ও নন্দিনীকে কী বলেছিল জান?

প্রকাশ ॥ কে কিশোর?

রত্না ॥ রক্তকরবীর কিশোর!

প্রকাশ ॥ দেখো গল্পটা পড়ি নি. মিস্‌কোট করলেও ধরতে পারব না বাদ দাও। কিন্তু ওই যে খুনোখুনির কথা বললে, ওটা আমার ভালো ঠেকছে না।

[একটু ভেবে প্রকাশ হাতে রিভালবার নিয়ে অভিনয় করবে]

কই কোথায় সেই ইডিয়েট প্রকাশ দত্ত, আমি আজ তাকে গুলি করে মারব। আর সেই মুখপুড়ি মেয়েটা গেল কোথায়? আমি কী করেছি বাপি? আমি তো ওকে নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাসি। দেখো এখন থেকে প্রত্যেক বছর আমি ওকে ভাইফোঁটা দেব ঃ

[সুর করে]

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা ।
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা ॥

ওঃ তাহলে তুমিই কালপ্রিট !

বিশ্বাস করুন মেশোমশাই, আমি রত্নাকে নিজের বোনের মতো স্নেহ করি, on god নিজের বোনের মতো, প্রায় নিজের বোনের মতো। ওরে বাবাঃ আপনার হাতে রিভালবার কেন? বিশ্বাস করুন আমি রত্নাকে কোনো দিন কিস করি নি, প্রায় বোন ভেবেই হামি খেয়েছি। দেখবেন ওর বিয়েতে আমি পিঁড়ি ঘোরাব। কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন করব। ওরে কে আছিস ছ্যাঁচড়াটা একবার এদিকে দেখা। আর দুটো কাঁচাগোল্লা দেব দাদা? একি দাদু, মাছের মুড়োটা খেয়ে নিন।

[গান]

'সোই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হল কই ?
তোমার যেদিন বিয়ে
সে দিন—কোমরে গামছা দিয়ে
পরিবেশন করেছিলেম
ছ্যাঁচড়া এবং দৈ ।'
সোই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হল কৈ ?

[গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রত্না হাততালি দেয়]

রত্না ॥ Beautiful, খুব ভালো হয়েছে। আর একবার চা হবে ?

প্রকাশ ॥ না থাক! তার চেয়ে কী করবে না করবে বসে একটু ভাবো।

রত্না ॥ আমি সব ভেবে রেখেছি প্রকাশ, কিছু চিন্তা কোরো না।

প্রকাশ ॥ ভেবে রেখেছ মানে? দুম করে কিছু করে বোসো না।

রত্না ॥ না গো মশাই দুম্ করে করব না, প্রথম থেকেই ব্যাপারটা ভেবে রেখেছি, কোন লাইনে যাব—কী কী করব!

প্রকাশ ॥ কী সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা, সব ভেবে রেখেছে অথচ প্ল্যানটা আমাকে বলছে না। কেবল বাঁদোর নাচাচ্ছে।

রত্না ॥ বাঁদোর নাচের এই তো শুরু, সারাজীবন নাচাব। (একটু হেসে) —এই কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কলেজ-স্কোয়ারের একটা শূন্য বেঞ্চে বসে আমাকে সেই যে প্রথম ভালোবাসার কথা বলেছিলে আর একবার তেমনি করে বলো না!

প্রকাশ ॥ ধ্যাত্ ও প্লানটা তো আমার না।

রত্না ॥ কার তবে?

প্রকাশ ॥ বন্ধুদের। ওরা বলল যদি প্রপোজ করতে চাস তো এই বেলা দুম্ করে বলে ফেল, নইলে কোন দিন দেখবি বে হাত হয়ে গেছে।

রত্না ।। তাই বুঝি সে দিন—'তোমাকে ভীষণ ভলো বাসি রত্না তোমাকে না পেলে আমি মরে যাব'—ভীষণ যাত্রা যাত্রা লাগছিল।

প্রকাশ ।। এই ভালো হচ্ছে না কিন্তু, ও সব পবিত্র ব্যাপার নিয়ে ক্যারিকেচার কোর না।

রত্না ।। আচ্ছা, সে দিন কী খেয়েছিলে বলতো তোমার মুখ থেকে গন্ধ বেরচ্ছিল ?

প্রকাশ ।। ব্রাণ্ডি ! মেসের বন্ধুরাই বলল, কয়েক চুমুক মেরে যা নার্ভ পাবি।

রত্না ।। মদ খেয়েছিলে ? তাই বুঝি অমন হেঁড়ে গলায় জোরে জোরে কথা বলছিলে ? বেশ লাগছিল কিন্তু !

প্রকাশ ।। কেমন ? যাত্রা যাত্রা ?

রত্না ।। না বেশ বোল্ড। মানে ছেলেরা যে রকম হলে ভালো লাগে। অমিতাভ--অমিতাভ ! জানো সেদিন এক বুড়ো ভদ্রলোক দূরের একটা ফাঁকা বেঞ্চে বসেছিল, তোমার কথা শুনে বুড়ো দেখি হাঁ করে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিল বুড়ো মনে মনে বলছে— 'কালে কালে কত দেখাবি মা' !

প্রকাশ ।। ধ্যাত্, মোটেই আমি অত জোরে কথা বলিনি।

রত্না ।। তোমার কি তখন মাত্রা জ্ঞান ছিল নাকি ? হাতটা এমন করে চেপে ধরে ছিলে মনে হচ্ছিল পাঞ্জা লড়বে। আঙুলগুলো টনটন করছিল।

প্রকাশ ॥ আহাঃ ননীর পুতুল, মরে যাই! দেখি হাতে ফুঁ দিয়ে দেই।

[প্রকাশ রত্নার হাত ধরবে, সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং হবে, আর ফোন বাজবে, প্রকাশ দেশলাই কাঠি জ্বালবে]

প্রকাশ ॥ মোম বাতিটাতি আছে?

রত্না ॥ না! ভোলার মাকে মোম বাতি কিনতে দোকানে পাঠিয়েছি; আরও কয়েকটা কাঠি রেডি রাখো।

[কথা বলতে বলতে রত্না ফোন ধরার জন্যে এগিয়ে যায় প্রকাশ একটার পর একটা কাঠি জেবলে আলো দেখায়]

রত্না ॥ হ্যালো! দিদি! হ্যা রত্না বলছি....কী বাবার স্ট্রোক! —কখন? ....পুরন্দরের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে .. কী বললি? বাবার শেষ কথা আমি ওকে গুলি করে মারব—আঃ।

[দেশলাই কাঠি নেভার আগেই দেখা যায় প্রকাশ রত্নকে ধরে ফেলেছে। অন্য হাতে ধরেছে ফোনের রিসিভার অন্ধকারে রত্নার দিদির কণ্ঠ শোনা যায়]

রত্নার দিদির কণ্ঠস্বর ॥ শোন রত্না পুরন্দরকে গাড়ি আনতে বলেছি। ও এলে বাবাকে নিয়ে শুভেন্দু কাকুর নার্সিং হোমে যাচ্ছি। তুই সোজা নার্সিং হোমে চলে আয়—পারবি তো? কিরে কথা বলছিস না কেন? রত্না—রত্না! লাইন কি কেটে গেল?

প্রকাশ ॥ দিদি শুনুন হঠাৎ স্ট্রোকের খবর পেয়ে রত্না অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আমি ওকে সুস্থ করার চেষ্টা করছি। না ভোলার মা নেই, মোম বাতি আনতে দোকানে গেছে। আমি প্রকাশ দত্ত....অনেক্ষণ আছি। এখন ওসব কথা থাক, কার কী রকম হার্টের অবস্থা তা তো জানি না। একটু সুস্থ হলেই আমি রত্নাকে নিয়ে নার্সিং হোমে যাচ্ছি। ওর জন্যে আপনি ভাববেন না—আমি তো আছি !

[খানিক পরে ধীরে ধীরে আলো ফুটবে। শুরু হবে দ্বিতীয় রঙ্গের অভিনয়। একই ঘর, আসবাব পত্র এবং টেলিফোন। এখানে প্রকাশ বয়স্ক মানুষ, সে রত্নার স্বামী এবং রত্না একজন মধ্যবয়স্কা নারী। প্রথম-রঙ্গের প্রকাশ ও রত্না যদি এখানেও অভিনয় করে তাহলে মেকাপের প্রয়োজন। মেকাপ ছাড়াই রমা ও মঞ্জু অভিনয় করতে পারে। প্রকাশ কাগজ পড়ছে। ভেতর থেকে রত্নার ডাক শোনা যায়]

নেপথ্যে রত্না ॥ এই শুনছ ? শুনছ না কি- -বলি শুনছো ?

প্রকাশ ॥ এখন অবধি কিছুই তো বললে না শুনবটা কী ?

রত্না ॥ যাক তাহলে কানে গেছে !

প্রকাশ ॥ না গিয়ে উপায় কী ! যা কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠ, খালি শুনছ শুনছ। কানের পোকা ঝরিয়ে দিলে।

রত্না ॥ অমন গজ গজ করছ কেন? কিছু খারাপ কথা বললে নাকি?

প্রকাশ ॥ (অনুচ্চস্বরে) এইরে শুনে ফেলেছে! (জোরে) না বলছিলাম আমার ঘাড়ে ঈশ্বরের দেওয়া কেবল একটাই মাথা—সঙ্গে দুটো কান আছে। সে দুটো দিয়ে কেবল শুনব!

রত্না ॥ বিনয়ের অবতার! ডাঃ দাস দে কে ফোন করেছ?

প্রকাশ ॥ করি নি! দু' দুবার রং নাম্বার তার পরেই ক্রস কানেকশন হয়ে বসে আছে। এখন কার যেন বোনপোর বউভাতের গল্প হচ্ছে।

রত্না ॥ আর একবার ট্রাই করো।

প্রকাশ ॥ রান্না ঘরে বসে হুকুম না চালিয়ে একবার বেরিয়ে এসো!

[চায়ের পেয়ালা হাতে রত্নার প্রবেশ]

রত্না ॥ রান্না ঘরে তো আমি শুয়ে আছি!

প্রকাশ ॥ (চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে) আঃ রাগলে তোমাকে যা দেখায় না-ঘ্যাম!

রত্না ॥ রাগলে না, বলো সেবা করলে। বঙ্কিমচন্দ্র খুব খাঁটি কথা বলেছেন, স্ত্রীলোকের রূপ গুণ যাই থাক কাজে কর্মে গদাইয়ের মা না হলে তোমাদের মনই ওঠে না।

প্রকাশ ॥ ইস্ বঙ্কিমবাবু তাঁর উত্তর পুরুষদের জন্যে এমন

সেম সাইড করে বসে আছেন !

রত্না ॥ না না ভয়ের বিশেষ কারণ নেই, স্ত্রীলোক একটু এ দিক ও দিক করলে তিনি কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছেন, মাথা মুড়িয়ে গোবর গিলিয়ে—ম্যাগোঃ !

প্রকাশ ॥ এ যুগে তোমরাও তাই বুঝি প্রতিশোধ নিচ্ছ।

রত্না ॥ আলবাত নেব। আজকাল মেয়েরাও যখন দু-তিন বার করে বিয়ে করে আমি বলি, বহু যুগের প্রতিশোধ—দে ব্যাটাদের নাকের ওপর ঝামা ঘসে।

প্রকাশ ॥ প্রতিশোধ নেবার কাজটা তুমি নিজেই নিলে না কেন ?

রত্না ॥ আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি কি তোমার সংসারে আছি ?

প্রকাশ ॥ সে কী, তুমি আমার সংসারে নেই ?

রত্না ॥ না ! নেহাত নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছি তাই, মা বাবা দেখে দিলে যে দিন রীণার সঙ্গে আমার তুলনা করে ছিলে সে দিনই চলে যেতাম।

প্রকাশ ॥ রীণার কেস্‌টা কী বল তো ? ঠিক মনে নেই।

রত্না ॥ যে অন্যায় করে তার মনে থাকে না। রীণা, রীণা—হালদার তোমাদেরই পুরনো পাড়ার সেই বাজে মেয়েটা, এ বার চিনতে পারলে ? তারও যে টুকু পার্সোনালিটি আমার নাকি তাও নেই।

প্রকাশ ॥ এই তো সারা জীবনে একটা অন্যায়, মানে একটা মাত্র মিস ফায়ার করে ফেলেছি।

রত্না ॥ ফাঁসি যাবার জন্যে একটা খুনই যথেষ্ট 'জীবনে একটা খুন করেছি,' বললে জজসাহেব ক্ষমা করবেন?

প্রকাশ ॥ তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। সিনেমার নায়িকাদের মতো পয়েণ্টে পয়েণ্টে কথা বলতে শিখেছ।

রত্না ॥ তোমার জন্যে! বুঝেছ, আমি কোন দিন কথা বলতে জানতাম না।

প্রকাশ ॥ না, কথা বলতে না বোবা ছিলে!

[কথা গুলি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে]

রত্না ॥ কী গজ গজ করে সাপের মন্ত্র ঝাড়ছ? জোরে বলো শুনি!

প্রকাশ ॥ বলে মার খাই!

রত্না ॥ মার খেতে, সে রকম মেয়ের পাল্লায় পড়লে— পড় নি তো: কী চেয়েছি তোমার কাছে, কেবল একটু ভদ্র ব্যবহার। একটা জিনিস বুঝেছি, কাউকে করুণা করতে নেই, করুণা করেছ কি মরেছ।

প্রকাশ ॥ প্রেম পুরনো হলেই বিস্বাদ। বিদেশে এই জন্যেই কনট্রাক্ট ম্যারেজ হচ্ছে বুঝলে?

রত্না ॥ বিদেশে কেন স্বদেশেও হচ্ছে। ইচ্ছে হলেই করতে পার।

প্রকাশ ॥ দেখব নাকি চেষ্টা করে?

রত্না ॥ দেখো কে তোমাকে ধরে রেখেছে।

প্রকাশ ॥ তোমার জন্যেই বলছি।

রত্না ॥ রক্ষে করো, পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে! মরে যদি আবার মেয়ে হয়ে জন্মাই—

প্রকাশ ॥ কপালের জোর থাকলে আবার আমাকে পাবে!

রত্না ॥ ক্ষেপেছ ও সব বিয়ের মধ্যে নেই। বিয়ে করলেই দাসী—বাঁদী, তার আগে নূরজাহান। (কাপ প্লেট গুছিয়ে যেতে গিয়ে) —যাক এ বেলা মাছের কী হবে?

প্রকাশ ॥ কাঁচকলা দিয়ে টানা ঝোল। পেটটা ভালো নেই।

রত্না ॥ টানা ঝোল আবার মেয়ের চলবে না, তেনার চাই রিচ্, মাখা মাখা। ছেলে তো মাছ ছোঁবেন না, তার জন্যে ডিম করতে হবে। একটা বাড়িতে এত রকম রুচি, এত রকম মেনু, আর পারি না বাবা!

[প্রস্থান]

[প্রকাশ ফোনের কাছে গিয়ে কিছু ভেবে ফোন করবে। এবং এক চান্সেই লাইন পাবে]

প্রকাশ ॥ হ্যালো! হ্যাঁ আমি....কী আর করব চা খাচ্ছি, কাগজ পড়ছি, আর ঝগড়া করছি... জোরেই তো বলছি এর চেয়ে বেশি জোরে আর বলা যাবে না। তুমি কী করছ?....খুব দেখতে ইচ্ছে করছে....ধ্যাত্? সত্যি বলছি! আচ্ছা টেলিফোনে যদি টি. ভির মতো দেখা যেত বেশ হত না?....খারাপ হত, কেন?....না

না তোমাকে মেকাপ নিতে হত না। শনিবার বিকেলে কী করছ? এসো না শুভকেও বোলো....বাইরে? তুমি আসছো তো? আছে রান্না ঘরে।

রত্নার কণ্ঠ নেপথ্যে ॥ কার ফোন গো, ডাক্তারের?

প্রকাশ ॥ (রত্নাকে শুনিয়ে জোরে) না না এমন কিছু সিরিয়াস নয়. আচ্ছা তোমার বউদিকে জিগ্যেস করব।

নেপথ্যে রত্নার কণ্ঠ : কার ফোন গো, ডাক্তারের?

প্রকাশ ॥ (ফোনের মুখটা চেপে) না শর্মিষ্ঠার, তোমার অপারেশনের কথা শুনে ফোন করেছে।

নেপথ্যে রত্নার কণ্ঠ ঃ আদিখ্যেতা, কার মুখে আবার শুনল তুমি নিশ্চয়ই চারিদিকে রটিয়ে বেড়াচ্ছ।

প্রকাশ ॥ ফোনে রান্না ঘর থেকে। আপনাকে শনিবার চা খেতে বলছে, না-না ভয়ের কিছু নেই. ডাঃ দাস দে অপারেশন করবেন। গাড়ি? আচ্ছা দরকার হলে বলব শনিবার আসছেন তো? রাখছি—নমস্কার।

[রত্নার প্রবেশ]

রত্না ॥ গাড়ির কথা কী বলছিল?

প্রকাশ ॥ বলছিল দরকার হলে সেদিন ওদের গাড়িটা দেবে।

রত্না ॥ তুমি কী বললে?

প্রকাশ ॥ গাড়ি নিলেই তো অবলিগেশন! তাই ঠিক হ্যাঁও করি নি, নাও করি নি।

রত্না ॥ চাইলেই পারতে। ওদের কি টাকার মা-বাপ আছে? বিজনেসের পয়সা!

প্রকাশ ॥ বেশ চাইব। এই শনিবার তো তোমাকে দেখতে আসছে।

রত্না ॥ তুমি আবার আসতে বললে কেন? ও সব লোক এলেই ঝামেলা—চা করো, খাবার আনাও, বসে বসে খালি বড়ো বড়ো কথা শোনো। আর ছেলেটা যা দস্যি গেল বার তো আমার জয়পুরের সিঁদুর কৌটোটা ভেঙে দিয়ে গেল।

প্রকাশ ॥ নিজে মুখ ফুটে বলল, রত্নাদিকে দেখতে যাব—আমি কি মানা করব?

রত্না ॥ রত্না দি! উনি কচি খুকি! বুড়ি বয়সের বিয়ে তাই ওই টুকু বাচ্চা, আমি দিদি!

প্রকাশ ॥ কী বলছো, শর্মিষ্ঠা তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো।

রত্না ॥ বয়েসে ছোটো? ছোটো লাগে! অমন সেজেগুজে আরামে থাকলে আমাকেও হেমামালিনী লাগতো—বুঝেছো?

প্রকাশ ॥ যাক্ ও সব কথা, নিজে মুখ ফুটে বলল রত্নাদিকে দেখতে যাব—

রত্না ॥ রত্না দিকে দেখতে, না প্রকাশদাকে?

প্রকাশ ॥ রত্না! দিন দিন তোমার মনটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে।

রত্না ॥ তুমিই কি আগে এমন ছিলে, আমার বন্ধুদের মুখের দিকেও চোখ তুলে তাকাও নি কোন দিন। মিসেস আজমানী তোমাকে ঠাট্টাকরে বলত ডরপোক্। আচ্ছা তুমি ওই শুটকীর মধ্যে কী দেখলে বলত ?

প্রকাশ ॥ যা বাবাঃ কোথা থেকে কোথায় এনে ফেললে! হচ্ছিল নেপোলিয়নের করনেশন—শুরু করলে উচ্ছের শুকতো।

রত্না ॥ আমি কিছু বুঝি না-না ? বয়েস তো পঞ্চাশ ছুঁতে চলল, এখনও বত্রিশ সেজে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না ?

প্রকাশ ॥ আমাকে যদি Young দেখায় তাতে তোমার বুক জ্বলে কেন ?

রত্না ॥ জ্বলবে না, কার জন্যে আমার চুল পাকল, কার জন্যে আমার নার্ভের অসুখ—বল ?

প্রকাশ ॥ আমার জন্যে তোমার চুল পেকেছে ?

রত্না ॥ তবে কার জন্যে! কবে তুমি সংসারের কোন দায়িত্ব পালন করেছো ? ঘরে খাটব বাইরে খাটব, তার ওপর মুখযন্ত্রণা। নার্ভের অসুখ কি এমনি এমনি হয়েছে। স্বার্থপর! বাবুনের ছোটো বেলায় কী কষ্টটাই না করেছি! কাজের লোক নেই, রুগ্নছেলে এক হাতে রান্না বান্না রাতজাগা, অফিস থেকে ফিরেই উনি ছুটলেন নাটক করতে, রিহার্সাল-গ্রুপ-কলসো!

কোথায় গেল তোমার সে সব দিন? ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, আজ এ কথা বলতে লজ্জা করে না!

প্রকাশ ॥ হুঁঃ নির্ঘাৎ প্রেসার বেড়েছে চেক করাতে হবে। দেখি অসীমকে ফ্লাটে পাই কি না, হয় তো এখনও চেম্বারে যায় নি।

রত্না ॥ প্রেসার! ওটাই বাকি, বলে বলে এনে ফেলো। মুখ তো নয়--

[দরজার বাইবে শব্দ হয় "Post man"—একটা খাম এসে পড়ে। খামটা তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে রত্না বলে]

রত্না ॥ জয়শ্রী দত্ত! কে লিখল দেখি তো?

[খাম খুলে পড়ে]

প্রকাশ ॥ কার চিঠি?

রত্না ॥ বলছি।

প্রকাশ ॥ কার চিঠি পড়ছো?

রত্না ॥ পড়েই দেখ। (চিঠি দেয়) মুখপুড়ি মেয়ে একবার বাড়ি আসুক দেখাচ্ছি মজা! এইটুকু বয়সে প্রেম হচ্ছে। প্রেম! সবে তো Class twelve, কলির সন্দে!

প্রকাশ ॥ (চিঠির দিকে ইঙ্গিত করে) ছেলেটা কে?

রত্না ॥ কে জানে!

প্রকাশ ॥ (গর্জন করে) কে জানে! তোমাকে জানতে হবে। মায়ের অনেক দায়িত্ব (চিঠি পড়তে পড়তে) নাও মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে পিকনিকে পাঠাও, সিনেমায়

পাঠাও, নাচতে পাঠাও! আমি তো ওল্ড ফুল—ব্যাক ডেটেড্। বাবা শত্রু মা বন্ধু। যত গুজ-গুজ ফুস-ফুস সব মায়ের সঙ্গে—নাও এবার ঠেকাও।

রত্না ॥ (করুণ কণ্ঠে) বা রে আমি কি এই বয়সে প্রেম করতে বলেছি। আজ দেখো না বাড়ি আসুক মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়ব।

প্রকাশ ॥ ওসব মারধোরের মধ্যে যেও না।

রত্না ॥ না—যাবে না, পুজো করবে।

প্রকাশ ॥ হ্যাঁ, পুজোই করবে। যা বলছি শোনো। মাথায় তোলার সময় তো মনে ছিল না। অত বড়ো মেয়ের গায়ে হাত তুললে—সমনেই লেক—কী যে করে বসে তার ঠিক নেই। কিম্বা কালীঘাটে গিয়েই হয় তো সিঁদুর টিঁদুর পরে বসবে। চিঠি পড়ে তো মনে হচ্ছে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। আচ্ছা তুমি ছেলেটার নামধাম দেখেও চিনতে পারছ না?

রত্না ॥ মনে হচ্ছে এ-সেই ছেলে।

প্রকাশ ॥ কোন্ ছেলে?

রত্না ॥ সেই যে গো। পয়লা January ওরা সব পিকনিক করতে গেছল—

প্রকাশ ॥ ও সেই দীঘায়?

রত্না ॥ হ্যাঁ?

প্রকাশ ॥ তোমাকে কোনোদিন কিছু বলে নি?

রত্না ॥ বলেছে অল্পসল্প। ছেলেটা ভালো। বাবা ডাক্তার, মা কোনো কলেজে—

প্রকাশ ॥ কী পড়ে ?

রত্না ॥ পড়ে না, মা কলেজে পড়ায় !

প্রকাশ ॥ আঃ আমি ছেলেটার কথা জিগ্যেস করছি।

রত্না ॥ বি. এ. না-না বি. এস সি. ফিজিক্সে অনার্স — যাদবপুরে।

প্রকাশ ॥ সবই তো জানো, ন্যাকামো করছিলে কেন ?

রত্না ॥ বিশ্বাস করো এর বেশি কিছু জানি না, পিকনিকের দিন বাসে তুলতে গিয়ে শুধু ছেলেটাকে দেখেছিলাম। ছ'ফুটের মতো লম্বা কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। পরে মাম্পুকে জিগ্যেস করে এ-সব কথা জেনেছি। কিন্তু এতটা গড়িয়েছে বলে জানতুম না। কোন দিন তো চিঠিপত্র খুলি নি, আজ সন্দেহ হতেই—বাড়ি আসুক একবার, শুটকির হাড়মাস এক করব।

প্রকাশ ॥ না-না ওসব মারধোরের মধ্যে যেও না। আজকালকার হিন্দী সিনেমা দেখা ছেলে-মেয়ে—সেই যে গো 'এক দুজেকে লিয়ে' বলি নি ? সে-দিন লেকের জলে হাতে পায়ে রুমাল বেঁধে জোড়ে ডুবে মরেছে। ওদেরও নাকি বাড়িতে মারধোর করা হয়েছিল।

[এরপর আবার কিছুটা চিঠি পড়ে নিয়ে]

যাই বল হাতের লেখাটা কিন্তু ভালোই। (পড়ে পড়ে শোনায়) "তোমাকে প্রায়ই বলতে শুনি বাবা উদার

প্রগ্রেসিভ্, আর মা সাক্ষাৎ দেবী। তবে কি আশা করতে পারি না, আমি মা বাবার আশীর্বাদ পাব ?" না ! ছেলেটার ওপর একটু একটু স্নেহ হচ্ছে গো। ছ'ফুট বললে না? তা হলে তো প্রায় অমিতাভ বচ্চন বল !

বন্না ॥ ঠিক তাই, মুখ-চোখ আরও সুন্দর।

প্রকাশ ॥ বলছ দেখব নাকি ?

রত্না ॥ মাম্পুর জন্যে? আমি বাবা এর মধ্যে নেই। ভালো হলে সব ক্রেডিট তোমার, আর খারাপ হলেই অমনি ধর বাঁদিকে !

প্রকাশ ॥ মোটেই না, কবে দেখেছ ?

রত্না ॥ বহুবার, কোনটার কথা বলব ?

প্রকাশ ॥ একটা বল।

রত্না ॥ সেই যে কবে নাকি অমিয় হালদার বাজারে ডেকে বলেছিল—"ছেলেকে একটু শাসন করবেন মি. দত্ত।" কি, না কটা ফোচ্‌কে ছোঁড়ার সঙ্গে মিশে স্কুলের মেয়েদের পেছনে লাগে। অমনি বাড়ি এসে বাজারটা ফেলে দিয়েই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে। "এই যে, তোমার ছেলের জ্বালায় তো পথেঘাটেও মুখ দেখাতে পারছি না।" আর আজ—"আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে"—বলতে লজ্জাও করে না !

প্রকাশ ।। মনেও থাকে বাবাঃ ! তা হলে দেখি কী বল ?

রত্না ।। বললাম তো, আমাকে জড়িও না, মেয়ে তোমার যা খুশি কর ।

প্রকাশ ।। আচ্ছা সব সময় তুমি অমন ঝগড়ার মুডে থাকো কেন বলত ?

রত্না ।। তোমার সঙ্গে আমার অন্য মুড ছিল কোনো দিন ?

প্রকাশ ।। (ধরতে যায়) কোনো দিন ছিল না ?

রত্না ।। ঢং দেখে আর বাঁচি না ! ছাড় ছাড় ডালটা বোধ হয় ধরে গেল, জল দিয়ে আসি ।

প্রকাশ ।। ধরুক আজ পোড়া ডালই খাব ।

রত্না ।। ধরুক ! খেতে বসে তখন লাফ্ দেবে, বাবাঃ তোমাকে চিনি না ।

[রত্নার প্রস্থান]

প্রকাশ ।। প্রায় ছ'ফুট বাবাঃ ! মেয়ে তো পাঁচ ফুট দুইঞ্চি— তাহলে ? বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া যাক । (সিগারেট প্যাকেট খুলে) এ্যাঃ গড়ের মাঠ ! কারও হাতটাত পড়ছে নাকি ? এই শুনছ, বলি শুনছ নাকি ?

রত্না ।। (নেপথ্যে) কিছুই তো বললে না শুনবটা কী ?

প্রকাশ ।। সিগারেট আনতে যাচ্ছি দরজা বন্ধ করো ।

[প্রস্থান]

[গজগজ করতে করতে রত্নার প্রবেশ]

রত্না ॥ তোমাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা-সিগারেট—আমাদের তো কিছুই লাগে না।

[দরজা বন্ধ করে রত্না মঞ্চের ঠিক মাঝখানে এসে টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নেয়। অদ্ভুত দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকায়। মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়। সহসা ফোন বাজবে। রত্না ফোন ধরবে]

রত্না ॥ হ্যালো ! স্যার ? হ্যাঁ রত্না... কার কাছে শুনলেন....ও আচ্ছা........Happy land-এ....date ঠিক হয় নি, Sunday ভর্তি হচ্ছি। ....কী দরকার এই তো ভালো, কাজের ভিড়ে একদিন ভুলেই যাবেন আমার কথা। এ কী ছেলেমানুষি হচ্ছে....স্যার ভুলে যান আমার কথা, মনে করুন রত্না বলে কেউ কোনো দিন ছিল না ! জানেন স্যার আমার মেয়ে জয়া—জয়শ্রী প্রেম করছে, আমার হাতে ওর লাভারের চিঠি .. ওসব কথা ভেবে কী লাভ, be practical ! আপনি একটা বিয়ে করুন স্যার... ছেলেদের আবার বয়েস ! প্রকাশ বলে ছেলেরা young যত দিন সে নিজে ফিল করে। আর মেয়েদের young না দেখালেই বুড়ি। ····আপনি একবার রাজি হয়েই দেখুন, মেয়ের বাপেদের তো চেনেন না, লাইন পড়ে যাবে। ....আপনাকে আসতে হবে না আমিই খবর দেব, আর তেমন কিছু হলে তো একদিন শুনতেই পাবেন। ....আমি কষ্ট পাই না ?

তা হলে তাই। এত দিনে বুঝেছেন তো মনটা পাথর দিয়ে তৈরি। আমাকে যত খুশি আঘাত করুন আমার লাগবে না। (সহসা উত্তেজিত) একদিন আপনার মা আমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমি কিছু মনে করি নি কেন জানেন ? ভেতরটা পাথর বলে ! কিন্তু আমিও তো মানুষ আমার, শরীরেও তো রক্তমাংস আছে, দুদিন বাদে অপারেশন টেবিলে অজ্ঞান হবার আগেও যে আপনার কথা মনে পড়বে। জানেন স্যার আমার ক্যানসার হয়েছে, ভয় পাবে বলে ওকে আজও জানানো হয় নি, ভীষণ নার্ভাস তো। বলুন ভেতরটা পাথর বলেই না এসব লুকিয়ে রাখতে পেরেছি.... ভয় নেই মরব না, ডাঃ দাস দে বলেছেন অপারেশন করলেই ভালো হয়ে যাব....রাখছি কেমন ?

[ফোন রাখে। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়]

যাচ্ছি যাচ্ছি।

[আবার কড়া নাড়ার শব্দ হয়]

বাবা রে বাবা এতটা আসব যেন তর সয় না।

প্রকাশ ॥ (ভেতরে এসে) ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি !

রম্ভা ॥ হ্যাঁ ঘুমচ্ছিলাম নাক ডাকার শব্দ শোনো নি।

[রম্ভা ভেতরের দিকে পা বাড়ায়]

প্রকাশ ॥ আরে যাচ্ছ কোথায় ? একটু শোনো না।

রত্না ॥ (ঘুরে) কী স্বার্থের কথা বলবে ?

প্রকাশ ॥ ওর ঠিকানা জান ?

রত্না ॥ কার ?

প্রকাশ ॥ ওই ছেলেটার কী যেন নাম ?

রত্না ॥ পরাশর, ঠিকানা তো চিঠিতেই আছে।

প্রকাশ ॥ চলো না একদিন যাই, ওর মা বাবার সঙ্গে আলাপ করে আসি। অবশ্য তার আগে তোমার অপারেশনটা হয়ে যাক, ডাঃ দাস দে তো বলেছেন মাইনর অপারেশন।

রত্না ॥ সে আমিও জানি, কিন্তু ছেলেটার মা বাবার সঙ্গে আলাপ করে কী হবে ?

প্রকাশ ॥ কিছু না একটু ইয়ে, মানে আলাপ আর কি— ছেলেটাকেও দেখে আসব। বেশ লিখেছে কিন্তু "বাবা ভীষণ উদার, প্রগ্রেসিভ, মা সাক্ষাৎ দেবী !"

রত্না ॥ ওঃ গ্যাসেই ভুলেছ ?

প্রকাশ ॥ গ্যাস কই না, কে বলল গ্যাস ! তুমিই বললে না প্রায় ছ'ফুট কোঁকড়ানো একমাথা চুল, অনার্স পড়ে, বাবা ডাক্তার, মা প্রফেসর—

রত্না ॥ তাতে কী হয়েছে, ছেলেটা যদি অনার্স না পায় ? মেজদির ছেলেটার মতো ট্যাবলেট না হেরোইন এই সব খেয়ে ঘুরে বেড়ায় ? প্রেম প্রেম খেলাটাই যদি ওর রোগ হয় ?

প্রকাশ ॥ ওরে বাবা এ সব তো ভাবি নি, তুমি যে আবার ভয়

ধরিয়ে দিলে! (রত্না যাবার জন্যে ঘোরে) যাচ্ছ কোথায়?

রত্না ॥ তোমাদের সেবায়!

প্রকাশ ॥ ধ্যাত্, সেবার নিকুচি করেছে, আমি বলে এ দিকে--

রত্না ॥ (কাছে এসে) চিন্তা কোরো না ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করেছি **brilliant student**, হীরের টুকরো বলতে যা বোঝায় তাই!

প্রকাশ ॥ তবে যে বললে—

রত্না ॥ চিঠিটা আমারই কথামতো লেখা, তোমরা যাকে বল পরিকল্পনা—তাই! তোমাকে হঠাৎ কী করে জানাই বলো, যা রাগী মানুষ!

প্রকাশ ॥ আগে থেকেই এ সব ঠিক করা? চিঠিটা আসবে, তুমি খুলে পড়বে, আমি দেখব, রাগ করব শেষে মেনে নেব। হা-হা হা, আচ্ছা খেল দেখালে বটে। তুমি না একটি-একটি--

রত্না ॥ সেবাদাসী—চলিত ভাষায় যাকে বলে গদাই এর মা।

[রত্নার প্রস্থান। প্রকাশ ফোন করবে]

প্রকাশ ॥ হ্যালো! ডাঃ দাস দে? আমি প্রকাশ দত্ত বলছি। এ দিকে সব ঠিক আছে। আপনি একবার ফোন করে কনফার্মড্ হতে বলেছিলেন তাই ...আচ্ছা আচ্ছা তাহলে **Sunday** তে নিয়ে যাব? ....আপনাকে আর কী বলব, আমার জীবন মরণ এখন আপনার হাতে। যদি কিছু হয়ে যায়, একটা **family** ভেসে

যাবে। ....না-না ক্যানসার বলে জানে না, আসল কথা কী জানেন ভীষণ নার্ভাস তো, শুনলে ভয় পাবে! তা হলে ভরসা দিচ্ছেন তো? রাখি, Sunday বিকেল চারটে। নমস্কার।

[ফোন রেখে কাগজটা হাতে তুলে নেয়]

নেপথ্যে রত্নার কণ্ঠ ঃ এই শুনছ, বলি শুনছ, শুনছ নাকি?

প্রকাশ ॥ এখন অবদি তো কিছুই বললে না শুনব কী!

রত্না ॥ যাক তাহলে কথাটা কানে গেছে।

প্রকাশ ॥ না গিয়ে উপায় কী! যা কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠ। খালি শুনছ শুনছ, একেবারে কানের পোকা ঝরিয়ে দিলে।

রত্না ॥ গজ গজ করে কিছু খারাপ কথা বললে নাকি?

প্রকাশ এই রে শুনে ফেলেছে। না, বলছি আমার ঘাড়ে ঈশ্বরের দেওয়া একটাই মাথা তার সঙ্গে দুটো কান আছে, সে দুটো দিয়ে কেবল শুনব—

রত্না ॥ বিনয়ের অবতার! ডাঃ দাস দেকে ফোন করেছ?

প্রকাশ ॥ করি নি! দু দুবার রং নাম্বার, তার পরেই ক্রস কানেকশন হয়ে বসে আছে। এখন কার যেন বোনপোর বউভাতের গল্প হচ্ছে।

[ধীরে ধরে পর্দা নামতে থাকে]

রত্না ॥ আর একবার ট্রাই করো।

প্রকাশ ॥ রান্নাঘরে বসে হুকুম না চালিয়ে একবার বেরিয়ে এসো।

[এখানেই পর্দা পড়বে।]

[তৃতীয় রঙ্গের আগে এখানে পাঁচ মিনিটের বিরতি দেওয়া যেতে পারে।]

[তৃতীয় রঙ্গে প্রকাশ দত্ত রত্নাদেবীর ছেলে। প্রকাশ কাগজ পড়ছিল। রত্নাদেবী চা নিয়ে ঘরে ঢোকে, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। আগের সেই ঘর, আসবাবপত্র এবং টেলিফোন। ফোনের কাছে একটি পুরুষের ছবি—মালা পরানো। মালাটা শুকিয়ে গেছে। দ্বিতীয় রঙ্গে প্রকাশের ভূমিকায় পরিচালক রমাপ্রসাদ এবং রত্নার ভূমিকায় মঞ্জু অভিনয় করবে। তৃতীয় রঙ্গে শ্যামল হবে প্রকাশ এবং বকুলদি মা রত্নার ভূমিকায় অভিনয় করবে।]

[কাগজ পড়তে পড়তে চায়ে চুমুক দেয় প্রকাশ এবং বিরক্তি সূচক শব্দ করে]

প্রকাশ ॥ উঁঃ!

রত্না ॥ কী হল?

প্রকাশ ॥ এক গাদা চিনি দিয়েছ, গরম সরবোত্!

রত্না ॥ তা হলে ওটা আমার চা, তোকে ভুল করে দিয়েছি। (হাতের কাপটা এগিয়ে দেয়) এটা তোর।

প্রকাশ ॥ কাপে চুমুক দিযে বাবাঃ তুমি এত চিনি খাও, নির্ঘাৎ ডায়বিটিস হবে।

রত্না ॥ আমি আর কী চিনি খাই রে, চিনি খেতো ও—আমার পরেও এক চামোচ। কোনো দিন তো ডায়বিটিস ছিল শুনি নি।

প্রকাশ ॥ ছিল ছিল জান্‌তি পারনি।

[কাগজে মন দেয়]

রত্না ॥ অত মন দিয়ে কী পড়ছিস ?

প্রকাশ ॥ খেলার খবর, কপিলদেব কী করেছে জান—কামাল করে দিয়েছে।

রত্না ॥ এই তো সে দিন গালাগাল দিচ্ছিলি।

প্রকাশ ॥ এ বারেও দিতাম আগের মতো জিরো রানে আউট হলে। আজ একটা কোম্পানি ওকে মারুতি **Present** করল।

রত্না ॥ এ টাই দুনিয়ার নিয়ম। ও যে বার ভোটে জিতল মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে তোর কনক কাকার সে কী নাচ ! ফুল, মালা, মিষ্টির, প্যাকেট, বাবারে বাবা সে যেন এলাহি কাণ্ড। তোর কনক-কাকা সে দিন বিকেলে চারটে ইলিস মাছ এনে ফেলে দিয়ে বলল, 'বৌঠান তোমার হাতে আজ আমরা ইলসা ভাতে খাব—তুমিই আমাদের লাকি স্টার !' আর যে বার ও ভোটে হেরে গেল—কেউ এল না সান্ত্বনা দিতে। লোড শেডিং। সারা পাড়া অন্ধকার। তোর জ্বর, মোমবাতির আলোয় আমি তোকে কোলে নিয়ে বসে আছি। অনেক দূরে কোথায় যেন তাসার বাদ্যি শোনা যাচ্ছে, মশাল হাতে ওদের মিছিল বেরল। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। ওর দিকে চোখ পড়তে বলল, 'ছিঃ' রত্না চোখের জল মোছো, এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম

Patriot কবিতায় পড় নি? "thus I entered thus I go"!

প্রকাশ ।। আচ্ছা মা তুমি কথায় কথায় বাবাকে এনে ফেল কেন বলো তো? তোমার কথা শুরু হয় উচ্ছের শুক্তো দিয়ে আর শেষ হয় বাবার কথায়। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে বাবার সঙ্গে তোমার রীতিমতো ঝগড়া হত। যদিও ঠিক বোঝবার বয়স হয় নি, তবু মনে হয় বাংলায় যাকে বলে happy দম্পতি তোমরা ছিলে না।

রত্না ।। happy দম্পতি! দেখেছিস কোথায়, সিনেমায়? মুখোমুখি বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা, উল বোনা— আর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে গান করা। ও সব কাব্য নাটকেই চলে জীবন জীবন, বড়ো কঠিন ঠাঁই।

প্রকাশ ।। কঠিন ঠাঁই বলে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করতে হবে? জানি না বাবা!

রত্না ।। আমরা চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করতাম! বেশ happy দম্পতি হয়ে দেখাস।

প্রকাশ ।। দেখো দেখে যদি--

রত্না ।। দেখে কী?

প্রকাশ ।। না কিছু, না!

রত্না ।। না কেন বল—

প্রকাশ ॥ বলছি দেখে শুনে যদি কুষ্টিটুষ্টি মিলিয়ে দাও তো নিশ্চয়ই happy হব।

রত্না ॥ কথা ঘোরালি কেন প্রকাশ, কী বলবি নির্ভয়ে বল না।

প্রকাশ ॥ আচ্ছা মা সংসারে happy শাশুড়ি বউ কেন হয় না বলো তো ?

রত্না ॥ কে বললে হয় না। আমাদের বাড়িতেই ছিল। তোর ঠাকুমা ঈশ্বরী বিন্দুবাসিনী দেবী আমাকে মেয়ের মতো ভালোবাসতেন, আমিও তাঁকে---

প্রকাশ ॥ (সহসা দুহাত মাথার দুদিকে ছড়িয়ে) অর্থাৎ ইতিহাসের সব কিছুই মহান ! মহান !
কালে কালে কতই না দেখব দিদি। আমরাও তো একদিন বউ হয়ে এইচি—শাউড়ি ননদ নিয়ে ঘর করিচি, সাত চড়েও রা কাড়িনি। আজকালকার বউগুলো দিদি, কী বলব ঘেন্নার কতা। ইতিহাসের সব কিছুই মহান—মহান—যুদ্ধ মহান বধূ হত্যাও মহান !

রত্না ॥ (শূন্য কাপগুলো নিয়ে যেতে যেতে) ফাজিল ! তুই নাটক কর নাম করতে পারবি। তারও এ গুণটা ছিল কথায় কথায় নাটক !

[প্রস্থান]

[প্রকাশ কিছু খুঁজতে খুঁজতে না পেয়ে]

প্রকাশ মা—মা, শুনচো

নেপথ্যে রত্না ॥ বল না শুনছি।

প্রকাশ ॥ আমার ডাইরিটা দেখেছ ?

[রত্নার প্রবেশ]

রত্না ॥ কোন্ ডাইরি ?

প্রকাশ ॥ কোন্‌টা আবার, ডাইরি তো আমার একটাই।

রত্না ॥ কী জানি বাবা তুই যে কোথায় কী ফেলিস আমি কি তার হিসাব রাখতে পারি !

প্রকাশ ॥ তোমার গোছানোর জ্বালায় আমার জিনিস হারায়। এই আছে, অমনি দুম করে সেটা সরিয়ে দিলে—নাম কিনা গোছানো।

[রত্না একগাদা বইয়ের তলা থেকে একটা ডাইরি বের করে]

রত্না ॥ দেখ তো এটা, প্রকাশ দত্ত ১০ই—

প্রকাশ ॥ (মুখে লজ্জার হাসি) হ্যাঁ।

রত্না ॥ নিজে রেখে আমার দোষ। ঠিক বাপের স্বভাব। উনিও যেখানে সেখানে জিনিস রাখতেন আর খুঁজে না পেলেই আমাকে ধরতেন : (এমন সময় ফোন বাজে) তুমিই কোথায় গুছিয়ে রেখেছ।

প্রকাশ ॥ (ফোন ধরে) হ্যালো ! দিদি....আছে দিচ্ছি।

রত্না ॥ বল সুমি, খবর সব ভালো তো ? ....মহারানী গেছেন কোথা ? ....ও পুজো দিতে ! কালী কেন কালীর বাবা এলেও ওকে বাঁচাতে পারবে না। ....তোকে এখন সহ্য করতে হবে মা, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা

বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। না-না-নির্মলকে বুঝিয়ে বলবি, এই বাজারে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকা—তা ছাড়া একবার বেরিয়ে গেলে ও সবই ছোটোর গর্ভে চলে যাবে। ....না তুই মাথা গরম করিস না। জোরে বল! শুনতে পাচ্ছি না—ধ্যাত্ লাইন কেটে গেল!

[ফোন রাখে]

প্রকাশ ॥ আচ্ছা মা দিদির শাশুড়ির ব্যাপারটা কী বলো তো?

রত্না ॥ ব্যাপার আবার কী! এক নম্বরের হারামি।

প্রকাশ ॥ এই-এই-কী হচ্ছে, তুমি আবার অশ্লীল শব্দ ব্যবহার কোরছ!

রত্না ॥ বেশ করব —হারামি-হারামি-হারামি! বাড়িটা নিজের নামে বলে এত দাপদাপানি।

প্রকাশ ॥ তা হলে তুমি বলছ দিদিরা happy শাশুড়ি-বউ হল না—তোমাদের মতো?

রত্না ॥ তুই থাম! কিসে আর কিসে, তোর ঠাকুমা কি মানুষ ছিলেন—দেবী।

প্রকাশ ॥ আচ্ছা মা আমার বউ যদি—

রত্না ॥ তুই থাম. ইসের ফুল খসল না এখন থেকেই বউ এর চিন্তা! তোর ভয় নেইরে, বউকে কেমন করে ভালো বাসতে হয় আমি দেখিয়ে দেব!

[ফোন বাজবে। প্রকাশ ফোন ধরে]

প্রকাশ ॥ হ্যালো! ও কাকাবাবু, ধরুন দিচ্ছি। তোমার ফোন—কনককাকা

[রত্নাকে ফোন দেয়]

রত্না ॥ বাবাঃ কী ভাগ্যি। এতো দিন পরে বৌঠানের কথা মনে পড়ল? সেই বছরতিনেক আগে একবার ফোন করে ছিলে....আর কি সেদিন আছে! একদিন বৌঠানের হাতের রান্না খাবার জন্যেই ছুটে আসতে... কার ওপর রাগ করব ভাই এটাই তো স্বাভাবিক! প্রকৃতির নিয়ম....এই আর কি, না মরে বেঁচে আছি।....খুকুর? চেষ্টা করছ? খুকুর বিয়ের জন্যে চিন্তা কী ভাই, মেয়ে তোমার সুন্দরী, তার ওপর লাখ-দুলাখ রেখেছ নিশ্চয়ই... প্রকাশের সঙ্গে! ভাবি নি ভাই। তা ছাড়া খুকু তো ওর চেয়ে বছর খানেকের বড়োই হবে।....না না আমার বেশ মনে আছে, প্রকাশ যখন হল খুকু তখন হামা দিচ্ছে।....হ্যাঁ আজকাল হচ্ছে কিন্তু আমরা তো আজকালকার মানুষ নই ঠাকুরপো.... ও তো এক্ষুনি বেরুল (হাতের ইঙ্গিতে প্রকাশকে চুপ করতে বলে) ... আচ্ছা বলব। রীণাকে নিয়ে একদিন এসো না অনেকদিন দেখিনি। এসো কেমন—রাখচি! (ফোন রাখে) হুঃ!

প্রকাশ ॥ কী ব্যাপার?

রত্না ॥ কী আবার, ধান্ধা। ওর সেই কালো শুটকী মেয়েটাকে তোর ঘাড়ে ঝোলাবার মতলব।

প্রকাশ ॥ কালো-শুটকী ? কে খুকু ! হা-হা, খুকু আবার কালো কোথায় ? ওতো দিদির চেয়েও ফরসা। আর শুটকী বলছ—অনেক দিন দেখ নি তো।

রত্না ॥ খুকু শুটকী নয় ?

প্রকাশ ॥ স্লিম ! তবে শুটকী নয় ! হঠাৎ দেখলে মনে হয় সমাপ্তির অপর্ণা সেন।

রত্না ॥ কিসের অপর্ণা সেন ?

প্রকাশ ॥ সমাপ্তির—সত্যজিৎ রায়ের ছবি।

রত্না ॥ কোথায় দেখলি ? ওদের বাড়িতে যাক নাকি ?

প্রকাশ ॥ না-না বাড়িতে যাইনা, হঠাৎ সেদিন মিনি বাসে দেখা হয়ে গেছল।

রত্না ॥ অনেক দিন তো দেখিস নি, চিনলি কী করে ?

প্রকাপ ॥ এই দেখ তুমি পুলিশী জেরা শুরু করে দিলে ! চেনা চেনা লাগল, তা ছাড়া সঙ্গে কাকীমা ছিলেন।

রত্না ॥ ওঃ তাই বলো—মহারাণীও ছিলেন !

প্রকাশ ॥ আচ্ছা মা তুমি রীণাকাকীমাকে like কর না কেন বলো তো ? আমার কিন্তু বেশ লাগে !

রত্না ॥ কথা শোনো, রীণাকে আমি দেখতে পারি না ! তোকে কে বলল ? রীণা বলেছে ?

প্রকাশ ॥ কী যে বল ! কাকীমা এ কথা বলতে পারেন !

রত্না ॥ ওঃ কাকীমার ওপর খুব যে ভক্তি দেখি। আমি রীণাকে like করি না —কেমন করে বুঝলি ?

প্রকাশ ॥ তুমি মিথ্যে রাগ করছ মা, আমার মনে হল।

রত্না ॥ আহা মনে হবার তো একটা কারণ থাকবে Logic ! নিজেই তো বলিস Logic please-Logic—

প্রকাশ ॥ বলব ?

রত্না ॥ বলো।

প্রকাশ ॥ নির্ভয়ে বলব ?

রত্না ॥ অভয় দিলাম। (বসে)

প্রকাশ ॥ বাবার সঙ্গে রীণাকাকীমার একটা ছবি ছিল, ইলেক-সনের পর তোলা। বাবার গলায় এক গাদা ফুলের মালা, রীণাকাকীমা বাবার পাশে দাঁড়ানো—হাসছেন ! ছবিটা এখনও তোমার শোবার ঘরে আছে কিন্তু রীণাকাকীমা নেই। ওর দিকটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

রত্না ॥ ঢং দেখে আর বাঁচি নে। ওর জীবনের এক স্মরণীয় দিনের স্মৃতি। ছবি তোলা হবে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একটু মেকাপ নিচ্ছি, ছবি তুলতে যাব, কোন ফাঁকে দৌড়ে-গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দুপাটি দাঁত বের করে—"আমার একটা ছবি, আমি আর এম. এল. এ-দা" ! আদিখ্যেতা সহ্য হয় না ! (সহসা সচেতন হয়ে) তুই-তুই ছবির কথা কী করে জানলি ?

প্রকাশ ॥ কনককাকাদের বাড়িতে পুরো ছবিটা আছে—দেখেছি !

রত্না ॥ (কঠিন কণ্ঠে) কবে ওদের বাড়ি গেছলি ?

প্রকাশ ॥ সেই যে দিন মিনিবাসে দেখা হল।

রত্না ॥ কোনো দিন তো বলিস নি।

প্রকাশ ॥ এমন আর কী কথা যে বলতে হবে। কাল অরিন্দমের সঙ্গে মেট্রোয় গেছলুম তোমাকে বলেছি? সব মানুষের একটা স্বাধীনতার জায়গা আছে—

রত্না ॥ অবশ্যই আছে, কিন্তু মনে রাখবি প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে আর গায়ের গয়না বেচে এ-সংসার চালিয়েছি, তোমার দিদির বড়ো ঘরে বিয়ে দিয়েছি, তুমি ইঞ্জিনিয়ার হতে যাচ্ছ। দুর্যোগের দিনে কেউ পাশে এসে দাঁড়ায় নি, আজ যদি কেউ গায়ে পড়ে আত্মীয়তা করতে আসে তা হলে সহ্য করব না।

প্রকাশ ॥ কী কথায় কী এনে ফেললে! তোমার ঋণের কথা কোনো দিন ভুলব না, কিন্তু সেই ঋণের কথাটা যখন নিজের মুখে বারবার স্মরণ করিয়ে দাও তখন—

রত্না ॥ তখন খুব খারাপ লাগে তাই না? কিন্তু স্মরণ না করিয়ে দিলে যে কেউ মনে রাখে না।

প্রকাশ ॥ কিন্তু কনককাকা তেমন লোক নয়। ওদের মুখে তোমার আর বাবার প্রশংসা শুনতে শুনতে এক এক সময় খুব লজ্জা হয়। অত বড়ো মানুষটা যখন বলেন আমি তো তোদের বাড়িতে খেয়েই মানুষরে প্রকাশ। তখন সত্যি বলছি, কানে হাত চাপা দিয়ে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে।

রত্না ॥ তুই—তুই—

প্রকাশ ॥ জানি এখন কী বলবে! তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। স্বীকার করছি আমি কনককাকাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাই।

রত্না ॥ এত দিন আমাকে বলিস নি কেন?

প্রকাশ ॥ আগেই তো বলেছি—এমন কিছু কিছু কথা আছে যা বলা যায় না—বলে ওঠা হয় না! সেটাকেই আমার স্বাধীনতা বলতে পার।

রত্না ॥ স্বাধীনতা! জানিস আমি ওদের পছন্দ করি না। মহিলা মোটেই সুবিধের নয়।

প্রকাশ ॥ কে রীণাকাকীমা! কিন্তু আমার তো –

রত্না ॥ জানিস ও কী সাংঘাতিক মহিলা!

প্রকাশ ॥ কিন্তু আমার তো—

রত্না ॥ জানিস এই রীণার সঙ্গে তোর বাবার নাম জড়িয়ে কী রকম স্ক্যান্ডাল রটেছিল? ওর পলেটিক্যাল কেরিয়ার একেবারে—

প্রকাশ ॥ মা ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। আর স্ক্যান্ডাল ইজ স্ক্যান্ডাল, তার মধ্যে সত্য থাকে না।

রত্না ॥ কে বললে সত্য ছিল না? প্রকাশ তোর কাছে আমি সব কথা বলতে পারব না। তুই আর ওদের ছায়া মাড়াস নে, ও মহিলা মায়া জানে। ডাইনী ডাইনী!

[কান্না চেপে প্রস্থান]

প্রকাশ ॥ (আপন মনে) সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ ! মায়ের পুরনো ট্রাঙ্কের তলায় একটা ছবি আছে কনককাকার সঙ্গে মা। ছবির রঙ এখন প্রায় বাদামী। কিন্তু দুজনের মুখের হাসিটা এখনও চেনা যায়। সে ছবি থেকে কনককাকাকে কেটে বাদ দেওয়া হয় নি যেমন বাদ পড়েছে বাবার ছবি থেকে রীণাকাকীমা।

[রত্না ফিরে আসে, একটু সামলে নিয়েছে]

রত্না ॥ তোকে এ সব কথা কোনো দিন বলতে চাই নি, কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে বললাম ! তুই ও বাড়িতে আর যাস নে, কেমন ?

প্রকাশ ॥ বেশ বলছ যখন—যাব না। কিন্তু লোপামুদ্রার তো কোনো দোষ নেই মা।

রত্না ॥ লোপামুদ্রা ? সে আবার কে ?

প্রকাশ ॥ খুকু, খুকুর ভালো নাম লোপামুদ্রা।

রত্না ॥ নামের কী ছিরি—লোপামুদ্রা !

প্রকাশ ॥ কেন কেন লোপামুদ্রা তো বেশ ভালো নাম—নতুনত্ব আছে।

রত্না ॥ অমন নতুনত্বের ক্যাঁতায় আগুন। যাকগে খুকুর কথা হচ্ছে না।

প্রকাশ ॥ কিন্তু এরপর খুকুর কথাই যে এসে পড়বে মা।

রত্না ॥ মানে ! তুই কী বলছিস স্পষ্ট করে বল।

প্রকাশ আমি—আমি খুকুকে—

রত্না ।। প্রকাশ ! (আর্তনাদ) তুই কী বলছিস !

প্রকাশ ।। জানি তুমি কষ্ট পাবে, তাই এতো দিন বলি নি।

রত্না ।। এখন বুঝতে পারছি কিসের জোরে কনক ঠাকুরপো বিয়ের প্রস্তাব করল।

প্রকাশ ।। লোপা খুব ভালো মা—এক দিন আনব ?

রত্না ।। না !

প্রকাশ ।। কিন্তু ছোটো বেলায় ও তো কতো এসেছে গেছে, আমরা খেলা করেছি।

রত্না ।। ছোটোবেলা ছোটোবেলা, ভুলে যা সে কথা।

প্রকাশ ।। আমি যে লোপাকে—

রত্না ।। এমন কিছু বলিস না যা শুনে আমার স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে।

প্রকাশ ।। বেশ বলব না।

রত্না ।। না বলিস না।

প্রকাশ ।। সত্যি কথা যখন শুনতে চাওনা তখন—

[ফোন বাজবে। প্রকাশ ফোন ধরবে]

প্রকাশ ।। হ্যালো ! বলো ! (সচেতন হয়ে রত্নার দিকে তাকায়) হ্যাঁ ফোন করেছিল, কিন্তু পরীক্ষার date ঠিক হয় নি। আসলে দুটো union এক জায়গায় মিট করতে পারছে না ! না আজ টিকিট পাওয়া যাবে না—House Full !

[এতক্ষণ রত্নাদেবী এক দৃষ্টে প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সহসা বলেন]

রত্না ॥ কার ফোন? আমাকে লুকিয়ে কথা বলছিস কেন?

প্রকাশ ॥ কই তোমাকে লুকব কেন? আমাদের Second semester এর date পেছবার কথা হচ্ছে—তাই অরিন্দম জিগ্যেস করছিল—

রত্না ॥ অরিন্দম! ধাপ্পা দেবার জায়গা পাস নি। বন্ধুকে তোরা আজকাল তুমি বলিস? ফোন দে আমি কথা বলব।

প্রকাশ ॥ কী হচ্ছে মা, অরিন্দম কী ভাববে বল তো?

রত্না ॥ কিচ্ছু ভাববে না—ফোন দে।

প্রকাশ ॥ বেশ নাও, এর পর স্ট্রোক হয়ে গেলে আমি জানি না।

রত্না ॥ হ্যালো! ও লোপামুদ্রা! বাবাঃ কতো বড়ো হয়ে গেছো, না চিনব কী করে মা, সেই ছোটো বেলার পর তো আর আস নি....তোমাব ওপর রাগ করব কেন খুকু—তোমাকে খুকুই বলি কেমন? ও সব লোপামুদ্রা টুদ্রা আমার আসে না। যা বলছিলাম—নিজের অদৃষ্ট ছাড়া রাগ আমার কারো ওপরেই নেই। খানিক আগে কনক ঠাকুরপো ফোন করেছিল তাকে যা বলার বলেছি....সব কথা তোমাকে বলা যায় না, আর বলতেও চাই না। কেবল এ টুকু জেনে রাখো, তোমরা যা চাইছ তা হবে না। ··· বেশ তো একদিন এসো না মাকেও এনো!....হ্যাঁ আছে দিচ্ছি।

[রত্না টেবিলে ফোন নামিয়ে রেখে চলে যায়।
প্রকাশ ফোন ধরে]

প্রকাশ ।। তোমাকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে লোপা! আচ্ছা, তুমি ফোনটা ছেড়ে দিলে না কেন?....ছাড়বে কেন? বাঁচার জন্যে, বাঁচার জন্যে লোপা।....না ভয় আমি কাউকে করি না, দুর্বলতা, না ঠিক দুর্বলতা নয়, স্নেহ-স্নেহ, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না—মা আমার জীবনে কী ভীষণ জরুরী।....হ্যাঁ ঠিক কথা—কিন্তু সব মা তো স্কুল করে, টিউশন করে, গায়ের গয়না বেচে, কাবলীওলার কাছে দেনা করে—হা হা-হা এতেই বোর হচ্ছ! আরও আছে, না এখন House Full নয়, রান্না ঘরে। রাখছি কেমন? ও দিকটা আবার manage করতে হবে তো! খানিক বাদে রিং কোরো result জানতে পারবে!···কখন? এই ধরো দশ মিনিট বাদে, রাখছি।

[ফোন রাখে]

[প্রকাশ সিগারেট ধরায়। রত্না ঘরে আসে ছাইদানী
প্রকাশের দিকে এগিয়ে দেয়।]

রত্না ।। আজ কী ডাল করব?

প্রকাশ ।। তোমার যা ইচ্ছে। আমার মতামতের মূল্য আছে?

রত্না ।। ওঃ অভিমান—আজ মুগ ডাল করছি। (বেরিয়ে যাচ্ছিল)

প্রকাশ ॥ মা !

রত্না ॥ বল !

প্রকাশ ॥ কিছুতেই লোপাকে মেনে নিতে পারবে না ?

রত্না ॥ না !

প্রকাশ ॥ যদি ওকেই বিয়ে করি ?

রত্না ॥ তা হলে তোর সঙ্গে আমার থাকা হবে না ! হয় তো আমি---

প্রকাশ ॥ মা ! তুমি আমার চেয়ে জেদটাকেই বেশি ভালোবাস !

রত্না ॥ তুইও তো আমার চেয়ে একটা মোহকে বেশি ভালোবাসিস ।

প্রকাশ ॥ সব ভালোবাসাই তো মোহ মা ! আমি লোপাকে বিয়ে করে সুখী হই তুমি চাও না ?

রত্না ॥ তোর সুখেই আমার সুখ, কিন্তু ওকে বিয়ে করে তুই সুখী হবি না !

প্রকাশ ॥ কেন সুখী হব না, সেটাই তো জানতে চাই !

রত্না ॥ বার বার কেনো-কেনো করিস না । সব কেনোর উত্তর নেই, আর থাকলেও দেব না ।

প্রকাশ ॥ তাহলে কারণটা আমিই বলি, তুমি সারা জীবন আমাকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চাও, যে জীবন বহু কষ্টে তৈরি করে দিয়েছ তা বেহাত হতে দেবে না এই তো ?

রত্না যে উত্তর তুই শুনতে চাস সেটা যে এর চেয়েও ভয়ঙ্কর নির্মম তাই তোকে শোনাতে চাই না, বরং আরও যতো কঠিন কঠিন কথা আছে বল—আমার সইবে।

প্রকাশ ॥ যা সত্যি তাই বলছি, আঘাত দেবার জন্যে বলি নি। তুমি রীণাকাকীমার চরিত্রের দোষ দাও, বাবার ছবি থেকে তাকে কেটে বাদ দাও, কিন্তু নিজের ছবি থেকে কনককাকাকে কেটে বাদ দিতে পার নি কেন, বলো—উত্তর দাও ?

রত্না আর কী বলবি বল, থামলি কেন ?

প্রকাশ । তুমি সারা জীবন রীণাকাকীমাকে ঈর্ষা করে এসেছ কারণ সে তোমার চেয়েও সুন্দরী, তোমার চেয়েও কালচার্ড ! আজ তোমার সেই ঈর্ষার আগুনেই চাইছ লোপাকে পুড়িয়ে মারতে।

রত্না ॥ তবে শোন্ ! ভেবেছিলাম কিছু বলব না কিন্তু তুই আমাকে বলতে বাধ্য করলি। শোন ; কঠিন সত্য সংসারে যদি কিছু থাকে তো শোন ; খুকু কনক ঠাকুরপোর মেয়ে নয়।

প্রকাশ ॥ মা ! কী বলছ ? লোপা কনককাকার মেয়ে নয় ?

রত্না ॥ না, খুকু ওর মেয়ে—তোর বাবার !

প্রকাশ ॥ এ তুমি কী বলছ ! আমার বাবা—রীণাকাকীমা না-না অসম্ভব !

রত্না ॥ সত্যি কথা শুনতে চেয়েছিলি না! রীণাকাকীমা কালচার্ড—ডাইনী। একসময় রাজনীতির নাম করে ওর সঙ্গে হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়াত, সেই-সময়কার ঘটনা। তোমাদের লোপামুদ্রা ওদের সেই উত্তাল জীবনের নীরব সাক্ষী।

প্রকাশ ॥ আমি বিশ্বাস করি না।

রত্না ॥ সত্য কারও বিশ্বাসের অপেক্ষায় থাকে না।

প্রকাশ ॥ এ সত্যি নয়, তোমার ঈর্ষা। যে ঈর্ষা থেকে সমাজে বধূ হত্যা হয়, যে ঈর্ষা ধর্মের মুখোশ পরে নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মারে—সেই ঈর্ষা!

রত্না ॥ আমি খুকুকে ঈর্ষা করি? বেশ, তুই ওকে বিয়ে কর।

প্রকাশ ॥ আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। বছর খানেক আগেই আমরা গোপনে রেজিস্ট্রি করেছি।

রত্না ॥ আমি বিশ্বাস করি না।

প্রকাশ ॥ সত্য কারও বিশ্বাসের অপেক্ষায় থাকে না।

রত্না ॥ ওদের যখন অমত নেই তখন গোপনে বিয়ে করলি কেন?

প্রকাশ ॥ আমাদের বিয়েতে রত্নাকাকীমার মত ছিল না, আজও নেই।

রত্না ॥ বিবেকের যন্ত্রণা! তা হলে শুরু হয়েছে?

প্রকাশ ॥ বিবেকের যন্ত্রণায় নয়, তোমার ভয়ে।

রত্না ॥ ভয়? কিসের? বধূ হত্যার?

প্রকাশ ॥ জানি না।

রত্না ॥ আজ এক বছর গোপনে রেখে হঠাৎ আজই বা প্রকাশ করলি কেন ?

প্রকাশ ॥ প্রকাশ না করে উপায় ছিল না তাই—

রত্না ॥ কী বলতে চাস !

প্রকাশ ॥ হঠাৎ জানতে পেরেছি লোপামুদ্রা মা হতে যাচ্ছে। ওকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই সন্তান নষ্ট করতে রাজি নয়। বলে আমাদের বৈধ সন্তান, নষ্ট করব কেন ? মা গো তোমরা অতীতে কেনো আমাদের জন্যে এতো বড়ো ভুলের প্রাসাদ তৈরি করে রাখলে ? পায়ের নীচে পদে পদে চোরা বালি ! মাগো সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কে করবে আমরা ? এ যুগের অয়দিপাউস !

[একটু চিন্তা করে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা পেনসিল কাটা ছুরি তুলে ভেতরের দিকে ছুটে যায়]

রত্না ॥ না ! শোন, প্রকাশ।

[চীৎকার করে প্রকাশের পেছনে পেছনে ছুটে ভেতরে যায়। এই সময় ফোনটা বেজে ওঠে, বেশ কিছু সময় ধরে ফোন বাজবে কেউ ফোন ধরবে না। সহসা নেপথ্যে রত্নার আর্তনাদ শোনা যায়]

ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে ॥

—ঃ সমাপ্ত ঃ—